Bajeyapta Itihas
Golam Ahmad Murtaza
Madina Publications

1st Pub: 2004

বাজেয়াপ্ত ইতিহাস

গোলাম আহ্মদ মোর্তজা

বাজেয়াপ্ত ইতিহাস

গোলাম আহমাদ মোর্তজা

মদীনা পাবলিকেশান্স
৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শাখা অফিস : ৫৫ বি (২য় তলা) পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

ভূমিকা

আমি আমার এই বক্তব্য সম্বলিত পুস্তকটির 'বাজেয়াপ্ত ইতিহাস' নাম দিলাম এইজন্য যে, আমার লেখা 'ইতিহাসের ইতিহাস' নামক ৮১২ পৃষ্ঠার যে গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত হয়েছে সেই প্রসঙ্গেই এটি লেখা।

অল্পই ছাপা হয়েছিল বইটি। মোটকথা প্রকাশের কিছুদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যায় সমস্ত কপি। চারিদিক থেকে বইয়ের চাহিদা জানিয়ে আসতে থাকে চিঠিপত্র। পুনর্মুদ্রণের প্রস্তুতি নিতে সময় লাগে। অবশেষে যখন ছাপবো ছাপবো করছিলাম ঠিক সেই সময় [সেপ্টেম্বর ১৯৮১] রেডিও আকাশবাণীর বিশেষ বার্তায় ঘোষিত হয় বইটির বাজেয়াপ্ত হবার সংবাদ। দৈনিক কাগজগুলোতেও প্রকাশিত হয় ঐ একই সংবাদ। সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য মানুষ আমাকে পত্র লেখেন, কেউবা দেখা করেন সরাসরি। সকলেরই প্রশ্ন, কেন নিহত হতে চলেছে এই গ্রন্থটি? তাঁরা জানতে আগ্রহী যে আমি এর জন্য কী করতে চাই?

বন্ধু-বান্ধব ও পাঠক-পাঠিকাদের নানান প্রশ্নের উত্তরের পরিবর্তে পুস্তক প্রকাশ করে ভিতরের কথা জানিয়ে দিতেই ছিল আমার এই পদক্ষেপ। এবারে প্রকাশিত হচ্ছে চতুর্থ সংস্করণ। অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের হাতে তুলে দিলাম এটাও।

গোলাম আহমাদ মোর্তজা

বাজেয়াপ্ত ইতিহাস

আমাদের ভারত রেডিও এবং সংবাদপত্র শুধু 'ইতিহাসের ইতিহাস' পুস্তকের বাজেয়াপ্ত হওয়ার সংবাদই ঘোষণা করেনি বরং বলা হয়েছে, তা ধর্ম ও জাতি বা কোন এক শ্রেণীর বিরুদ্ধে নাকি লেখা। আমি পরিষ্কার করে জানাতে চাই যে, গ্রন্থটি অহেতুক কোন শ্রেণী, ধর্ম ও বর্ণ বিরোধী তো নয়ই বরং যাতে মিলেমিশে সকলে বসবাস করতে পারেন, চিরস্থায়ী ভেদবুদ্ধির অবসান যাতে ঘটে, ভারতবর্ষ আজ ত্রিখণ্ডে খণ্ডিত, অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে আর যেন খণ্ডিত না হয়, সেই উদ্দেশ্যেই তা লেখা।

সাম্প্রদায়িকতার ভেদবুদ্ধি ও হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গার মূলে আছেন সাম্প্রদায়িক মনোভাবের কিছু লেখক। সেই লেখা যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে এই অশান্তি সহজেই দূরীভূত হবে।

এখন দেখা যাচ্ছে আমার বক্তব্য আর সংবাদ মাধ্যমগুলোর বক্তব্য দুটো পরস্পর বিরোধী। যাঁরা বইটা পড়েননি তাঁরা কোন্‌টা বিশ্বাস করবেন?

পশ্চিম বাংলার প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা যুগান্তরে [১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৮১, ২রা আশ্বিন শনিবার] সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার চতুর্থ কলামে প্রকাশিত হোল ঃ 'ইতিহাসের ইতিহাস' বাজেয়াপ্ত। সরকার ইতিহাসের ইতিহাস শীর্ষক বাংলা বইটিকে বাজেয়াপ্ত করেছে। এই বইটির লেখক গোলাম আহমাদ মোর্তজা। কোন কোন স্কুলে এই বইটি পড়ানোও হয়। ফলে দেখা দেয় দারুণ বিক্ষোভ। সরকার এক বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, বর্ধমান জেলার মেমারীর বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশনের [মদীনা মার্কেট] এই বইটি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

এমন হতে পারে যে, তাঁদের কাছে সরকার যা নোট দিয়েছেন তাই তাঁরা ছাপতে বাধ্য হয়েছেন। শুধু ছোট্ট একটা কথা বলতে চাই, ভারতে বর্তমানে যত কোটি ভাইবোন আছেন আমি চ্যালেঞ্জের জন্য সবাইকে আহ্বান করি—কেউ কি প্রমাণ করতে পারবেন যে বইটা ভারতের কোনও স্কুলের পাঠ্যপুস্তক? সূর্যের মত পরিষ্কার আলোকে অন্ধকার বলার মত এটা অসত্য এবং ষড়যন্ত্র নয় কি?

এমনিভাবে দৈনিক 'পয়গাম', উর্দু দৈনিক 'আজাদহিন্দ', ইংরাজী 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রভৃতি সংবাদপত্রেও উপরোক্ত কথাগুলো ছাপা হয়েছে।

ইতিমধ্যে ইংরাজী পত্রিকা 'দি স্টেটসম্যান' এবং বাংলা পত্রিকা 'আজকাল'-এ আর একটি সংবাদ বের হয়। দুটি পত্রিকারই সংবাদ একই অর্থবহ। ২৭শে নভেম্বর

১৯৮১তে আজকাল পত্রিকায় ছাপা হোল : চণ্ডিগড়ে বাংলা বই-এর উপর নিষেধাজ্ঞা। চণ্ডিগড়, ২৫শে নভেম্বর—চণ্ডিগড় প্রশাসন কর্তৃপক্ষ গতকাল ইতিহাসের ইতিহাস নামের একটি বাংলা বই নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। বইটির লেখক বর্ধমানের মেমারীর গোলাম আহমেদ মরতুজা। বলা হয়েছে জাতীয় স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে বইটির উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হল। কেন্দ্রীয় শাসিত চণ্ডিগড়ে বইটির বেচাকেনার উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা হয়েছে। পি.টি.আই.

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, এই চণ্ডিগড়ের ভাষা বংলা নয়; সুতরাং সেখানে আলোচনা হয়ে সেই বই বন্ধ হওয়া—সেখানকার জনসাধারণও তার মানে বুঝতে মুশকিলে পড়ে গেছেন। কত বড় ষড়যন্ত্র! ইংরাজী স্টেটসম্যানেও এ খবর ছাপা হয়ে চারিদিকে এত রৈরৈ হৈহৈ হয়ে গেল। তাহলে কি বইটি সত্যিই কোন ধর্ম বা কোন জাতির বিরুদ্ধে লেখা?

বইটি ছাপা হয়েছে ১৯৭৮তে। আর নিষিদ্ধ হচ্ছে ১৯৮১তে। এই দীর্ঘ চার বছর ভারতের কোটি কোটি মানুষ কেউ কোনদিন যুগান্তর, আনন্দবাজার, বসুমতী, আজকাল, সত্যযুগ প্রভৃতিতে বইটির প্রতিবাদে একটি পত্রও লিখলেন না। এ এক বিরাট গোলক ধাঁধা। মানুষের মনে প্রশ্ন থেকেই গেল, তবে বইটা নিষিদ্ধ হল কেন?

বইটি বাজেয়াপ্ত হওয়া কি লেখকের দুর্ভাগ্য? নাকি পাঠক-সাধারণের দুর্ভাগ্য? নাকি যাঁরা বইটি বন্দী করে আটকে রেখেছেন তাঁদেরই দুর্ভাগ্য?

প্রথমে আমার কথাই বলি—আমিই লেখক ঐ বন্দী বই 'ইতিহাসের ইতিহাস'-এর। আমার আর এ বই ছাপানো চলবে না। সুতরাং অন্য ক্ষতির সঙ্গে বড় রকমের অর্থনৈতিকও ক্ষতি এটা।

আমাকে পৃথিবীর কজন চিনতেন? বড় জোর 'পুস্তক সম্রাট' ও 'সেরা উপহার' বইয়ের লেখক হিসেবে শুধু তাঁরাই চিনতেন যাঁরা বাঙ্গালি পাঠক। আর চিনতেন আমাকে বক্তা হিসেবে। কিন্তু আজ রেডিওতে দুর্নাম অথবা সুনাম ছড়িয়ে পড়াতে, সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ রেডিওতে শুনে নিলেন, ইংরাজী, বাংলা, উর্দু পত্রিকায় যখন ছাপা হোল তখন সকলে বুঝে নিলেন যে, একজন লেখক আছেন যাঁর নাম গোলাম আহ্‌মাদ মোর্তজা, বাড়ি মেমারী টাউন, বর্ধমান জেলা। কী একটা বিরাট বিষয় তাতে ছিল যা নিষিদ্ধ না করে সরকারের উপায় থাকে নি?

সব সমাজেই আমার বর্ক্তৃতা শোনার জন্য চিরদিনের ভীড়। যদি আমি সাম্প্রদায়িক মনোভাবের মানুষই হোতাম তাহলে যে সমস্ত স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের মাঝে আমি বক্তব্য রাখি তাঁরা কেন আমার বক্তব্যে মুগ্ধ হন? কই কোথাও তো কোন অঘটন ঘটে নি। কেউ তো কোন পত্রিকায় একটি প্রতিবাদপত্রও ছাপতে দিলেন না? ভারত বা ভারতের বাইরে যে সমস্ত বক্তব্য রেখেছি•সে কথা ছেড়ে দিয়ে যদি শুধু পশ্চিম বাংলার কথাই ধরা হয় তাহলে

বর্ধমান রাজ কলেজ, শ্যামসুন্দর কলেজ, ইটেচোনা কলেজ, বহরমপুরের কে. এন. কলেজ, ২৪পরগণার বারাসাত কলেজ, লক্ষ্মীকান্তপুর কলেজ, টেংরাখালি কলেজ, মেহমানপুর কলেজ, জঙ্গিপুর কলেজ, আওরঙ্গবাদ কলেজ, বর্ধমান রামকৃষ্ণ মিশনের মত অনেক মিশনের সেমিনার, বাণীপুর বি.টি. কলেজ, বোলপুর কলেজ, গুসকরা কলেজ, ধনেখালি কলেজ, হরিপাল কলেজ, কলকাতার মৌলানা আজাদ [গভঃ] কলেজ, মালদহের বিভিন্ন কলেজ ও অসংখ্য স্কুলগুলোর কথা বলতে হলে রেকর্ড লম্বা হয়ে যাবে। তাছাড়া রামকৃষ্ণ মিশন, বর্ধমান টাউন হল, মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর হল, কলকাতা মহম্মদ আলি পার্ক প্রভৃতি বহু গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ধর্মভিত্তিক, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য, ভূগোল, মনস্তত্ত্ব ও সমাজ বিজ্ঞানের উপর অনেক বক্তব্য রেখেছি কয়েক দশক ধরে। সকলেই একমত হয়েছেন, তাঁদের চোখে আমি সাম্প্রদায়িকতার উর্ধের মানুষ। আর এই বইটির জন্য এক কলমে জানানো হোল—বইটি নাকি কোন সম্প্রদায়ের ধ্যান ধারণা বিরোধী বা উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে লেখা ইত্যাদি।

পৃথিবীতে শুধু আমার বইটিই যে প্রথম নিষিদ্ধ হোল তা নয়। সব দেশে সব যুগেই অনেকক্ষেত্রে সবল হাত দুর্বলের টুঁটি চেপে ধরেছে। বই বাজেয়াপ্ত করাও অনেক ক্ষেত্রে তাই। অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে।

বিজ্ঞানীরা চাঁদে গেলেন। এখন চাঁদের দেশের সত্য তথ্য ও ছবি সম্বলিত ভাল বই পড়ে কোন দল বা গোষ্ঠী যদি আন্দোলন করে যে আমাদের ধর্মে লেখা আছে চাঁদে যাওয়া সম্ভব নয় অথবা চাঁদ আমাদের ভগবান, তার উপর চড়া, প্রস্রাব করা, সিগারেট খাওয়া এসব মোটেই সম্ভব নয়—সুতরাং ইনকেলাব জিন্দাবাদ এই বই বন্ধ হোক! তাহলে কি সঙ্গে সঙ্গে সরকার বইটি বন্ধ করে ফেলবেন? একটা নোটিশও দেবেন না লেখককে? তাঁকে বইটির সত্যতা প্রমাণ করবার সুযোগও দেবেন না? দুই আর দুই-এ চার হয় এ জ্ঞান যাঁদের আছে তাঁরা বলবেন, হ্যাঁ তা দেওয়া উচিত। কিন্তু আমি গরীব লেখক জানাচ্ছি, সরকার আমাকে আজও কোন নোটিশ করেন নি। কোন কেসও করেননি, শুধুই 'জাঁহাপনার আদেশ'।

একটা কথা বলে রাখা দরকার, যাঁরা 'ইতিহাসের ইতিহাস'কে শুধু 'ইতিহাস' বলে মনে করেছেন তাঁরা একটু ভুল করেছেন, বরং ওটা 'ইতিহাসের ইতিহাস'। এইসব 'ইতিহাসে'র সঙ্গে তা মিলবে কি করে? যেমন মনে করুন, সব ধর্মে ও নীতিতে অসুস্থকে সুস্থ করার জন্য ওষুধ খাওয়া নিষিদ্ধ নয়, বরং অনুমোদিত। রোগ প্রতিরোধে ওষুধ খাওয়া এবং খাওয়ানো পবিত্র কর্ম। সুতরাং পবিত্র মসজিদ, মন্দির ও গির্জায় উপাসক খেতে পারেন তাঁর ওষুধ এ্যালপ্যাথিই হোক আর হোমিও-বায়োকেমিকই হোক। যদি এমন একটি বই লেখা হয় যার নাম 'ঔষধের জন্মকথা'—তাহলে তাতে দেখা যাবে কোনটি তৈরি হয়েছে সাপের নোংরা বিষ হতে, কোনটি তৈরি হয়েছে বসন্তের পুঁজ হতে, কোনটি তৈরি হয়েছে শুয়োরের রক্ত

হতে আবার কোনটি তৈরি করা হয়েছে গরুর রক্ত থেকে। তাহলে কি হৈহৈ করে মিছিল বের করতে হবে? কারণ মন্দির মসজিদ সব অপবিত্র হয়ে গেল! তাহলে কি আমরা সব গরু ও শূয়োরের রক্ত খাই? আর সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা রুখতে বইটি নিষিদ্ধ করা হবে? পা থাকলে হোঁচট লাগে, চোখ থাকলে চোখের অসুখ হয়, তাই বলে কি হাঁটা নিষিদ্ধ করতে হবে বা চোখ তুলে ফেলে দিতে হবে, যাতে আর কোনদিন রোগ হতে না পারে? একটু আগে যা বলেছি—গরু ও শূয়োরের রক্ত হতে ওষুধ তৈরির কথা; অনেকে লোককে বোঝাবার জন্য নিছক ভূয়ো উদাহরণ মনে করতে পারেন। কিন্তু গত ১৯৮১-র ২৭শে নভেম্বর শুক্রবার আজকাল পত্রিকায় মোহন চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'গোমাংসের উপকারিতা' শীর্ষক প্রবন্ধে জানানো হয়েছে গরু থেকে আমরা কি কি পেয়ে থাকি। পর পর সাতটি নম্বর আছে। তার মধ্যে ৪ নম্বরে লেখা আছে গরুর রক্তে ওষুধ হয়, ৫ নম্বরে আছে গরুর রক্তে এণ্ডোক্রাইন গ্লাণ্ড—হরমোন জাতীয় ওষুধ তৈরি হয়।

আমরা আকবর, অশোক, জহরলাল, গান্ধী, মৌলানা আজাদকে শ্রদ্ধাস্পদ মনে করি কিন্তু তাঁদের পেছনে কিছু অন্ধকার থাকতে পারে, কিছু নোংরামি হয়ত থাকতে পারে সেটা রাজনৈতিক কারণে চেপে দেওয়া চলতে পারে কিন্তু সত্যের খাতিরে অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গকে জানাবার জন্য কিছু পুস্তকের প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ ভারতের নোবেল প্রাইজ পাওয়া রত্ন কিন্তু তিনি স্কুল ফাইনাল পাশ ছিলেন না। নজরুলও ভারতের গর্ব কিন্তু দশম শ্রেণী পাশ করা তাঁর সৌভাগ্য হয়নি। এই কথাগুলো রাজনৈতিক কারণে চাপা রাখলেও তথ্য হিসাবে এর দলিল থাকা উচিত। 'ইতিহাসের ইতিহাস' বইটিও ছিল এই একই বস্তু।

বিশ্বসুন্দরী নূরজাহান বা মোনালিসা যে সুন্দরী সে তো জানা কথা। কিন্তু এ্যানাটমির বই-এ যদি বিশ্বসুন্দরীর কঙ্কালের ছবি দেওয়া হয় অথবা তার উপরের চামড়া খুলে শুধু শিরা-উপশিরা জড়ানো খোসা ছাড়ানো মাংসের ছবি দেখানো হয় তাহলে তা সুন্দর লাগবে না হয়তো। কিন্তু তাই বলে কোনও সুন্দরী দেহের কঙ্কালের আলোচনা করার বা লেখার অধিকার কারো থাকবে না? হজরত মুহাম্মাদ [সঃ] বিশ্বের প্রত্যেকের, বিশেষ করে মুসলমানদের নিকট শ্রেষ্ঠতম শ্রদ্ধাস্পদ। তাঁর চেয়ে বড় সম্মান আর কাউকে মুসলমানরা করতে পারেন না। যদি দেখা যায় পৃথিবীতে একজন বীর আছেন যাঁর ওজন তিন মণ অর্থাৎ হজরত মুহাম্মাদ [সঃ] অপেক্ষা ওজনে ইনি শ্রেষ্ঠতর হচ্ছেন। তাহলে কি মিথ্যা করে বলতে হবে ঐ হজরতের ওজন ছিল চার মণ! অথবা ইন্‌কেলাব জিন্দাবাদ, এই ওজনের তথ্য বন্ধ করতে হবে, কারণ ওতে আমাদের বিশ্বাসের উপর আঘাত হানা হচ্ছে।

সব ইতিহাসে যা আছে তা 'ইতিহাসের ইতিহাসে'ও থাকবে কখনই তা নয়, বরং 'ইতিহাসের ইতিহাসে' এমন জিনিস থাকবে যা সরকার নিয়ন্ত্রিত ইতিহাসে থাকবে না। অবশ্য যা কিছু থাকবে তার পিছনে থাকবে উদ্ধৃতি, যুক্তি, ফটো প্রভৃতি প্রমাণ

সমূহ। আমার লেখা 'ইতিহাসের ইতিহাসে' তার অভাব থাকলে তার বিচার হওয়া দরকার। তথ্যবিহীন, উদ্ধৃতিবিহীন, যুক্তিবিহীন কথাগুলো অবৈধ ঘোষণা করা হতে পারে। তাহলে সেই আপত্তিকর বিষয়গুলো কোনদিন আর লেখা যাবে না। সেটাই জ্ঞানী ও শিক্ষিত মানুষেরা চান।

একটু আগেই বলেছি চাঁদে যাওয়ার কথা। আর চাঁদে যেতে হলে যেসব গবেষণাগার আছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য গবেষণাগারটি হচ্ছে ইউরোপের বৃটেনে। সেই বৃটেনে যে বইটি প্রথম নিষিদ্ধ হয়েছিল সেটার নাম Tynda Bible। খৃষ্টধর্মে স্ত্রী পরিত্যাগ করার যে নিয়ম ছিল তা নিয়ে তখনকার রাজা অষ্টম হেনরী তাঁর ব্যক্তিগত অসুবিধার কারণে নিজের দলবল নিয়ে ঐ বইটিকে বাজেয়াপ্ত করেন। ইতিহাস আজও ভোলেনি বইটির কথা আর বাজেয়াপ্তকারীর কথা।

ইংরাজিতে একটা ভাল বই আছে—Banned Books, লেখক Anne Byon Haight। তাতে কোন্ ভয়ে কোন্ আতঙ্কে কোন্ কোন্ বই বাজেয়াপ্ত হয়েছে সেইসব কথা লেখা আছে। অবশ্য সাময়িকভাবে বাজেয়াপ্ত হয়ে আবার তা ছাপাবার আদেশ দেওয়া হয়েছে এমন নজিরও বৃটেনে আছে। যেগুলোর বাজেয়াপ্তকারীদের দোষ ইতিহাসে স্থান পায়নি, কারণ তা সংশোধিত।

১৯৩৩ সালের ১০ই মে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পঁচিশ হাজার বই পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। খৃষ্টপূর্ব ২৫০ অব্দে চীনের সম্রাটরা কনফুসিয়াসের সমস্ত বই পুড়িয়ে দেয়। সেইসঙ্গে লেখকের কয়েকশত অনুগামীকে নিষ্ঠুরভাবে জীবন্ত কবর দেয়। 'গ্যালিভারস ট্রাভল' কোন রাজনৈতিক বই নয়, তা একটা উপন্যাস মাত্র। কিন্তু ষড়যন্ত্র করে প্রমাণ করা হয় ঐ বই নাকি অশ্লীল। তখন আয়ার্ল্যান্ডে ঘোষণা করা হয়, সরকার নৈতিকতা রক্ষার জন্য এই বই বাজেয়াপ্ত করলো।

রাশিয়ার প্রথম নিকল্সন মিঃ এ্যানডারসানের 'ওয়ানডার স্টোরিজ' বইটি বাজেয়াপ্ত করেন। অথচ বইটি অশ্চর্য গল্প ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু ষড়যন্ত্রের শিকার এমনি করেই বাঁধা পড়ে।

১৯২৯ সালে The Call of the World বইটি ষড়যন্ত্রের শিকার হয় অর্থাৎ নিষিদ্ধ হয়। Green Pastures নাটকটিও নিষিদ্ধ হয়েছিল ইংলণ্ড ও নরওয়েতে। 'পিটার এ্যান্ড পেগি' বইটি ধর্মে আঘাত হেনেছে বলে নিষিদ্ধ হয়। 'ডিভাইন কমেডি' ফ্রান্সে নিষিদ্ধ হয়। বইটির লেখক ছিলেন মিঃ দান্তে। সময়টা ছিল ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ।

লাইব্রেরি হতে বই সরিয়ে দেওয়া আজও বন্ধ হয়নি। বই পড়ার স্বাধীনতা নষ্ট করার চেষ্টা, সুচেষ্টা নয় বরং তা অপচেষ্টা। এ প্রসঙ্গে ১৯৫৫ সালের ১৪ই জুন ডটিমাউথ কলেজে প্রেসিডেন্ট মিঃ আইসেনহাওয়ার যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা উল্লেখযোগ্য —"Don't think you are going to conceal faults by concealing evidence that they ever existed. Don't be afraid to

go in your library and read every book, as long as any document does not afford our own ideal of decency. That should be the only censorship.

How will defeat communism unless we know what it is, what it teaches, and why does it have such in appeal for men, why are so many people swearing allegiance to it? Its almost a religion, albeit one of the neither regions."

বই পড়ার স্বাধীনতার উপর ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে মিঃ মিলটন সুচিন্তিত ভাষণ দেন ইংলণ্ডের পার্লামেন্টে। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ষ্টুয়ার্ট মিলও ঐ বিষয়ের উপর দৃঢ়মত পোষণ করেন।

অনেক অকমিউনিষ্ট দেশে কমিউনিজম মার্কা বই পোড়ানো হয়েছে এবং ক্রয়-বিক্রয়ও বন্ধ করা হয়েছে। যেমন আমেরিকায় বহু লাইব্রেরিয়ান ও পাবলিশারদের নেতৃত্বে জনমত বা আন্দোলন গড়ে ওঠে যাতে কমিউনিষ্টদের লেখা বই পড়বার স্বাধীনতা পাওয়া যায়। ফলে ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা মে আমেরিকান লাইব্রেরি এ্যাসোসিয়েশেন কাউন্সিল এক সম্মেলনে প্রস্তাব নেন— It is in the public interest for publishers and librarians to make available the widest diversity of views and expressions, including those which are orthodox or unpopular with majority.

আমাদের ভারতবর্ষেও উর্দু, হিন্দী, আরবী, অসমিয়া, গুজরাটি, তামিল, তেলেগু. ফারসী প্রভৃতি বহু ভাষার বই বন্ধ করা হয়েছে। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখিত 'যুগবাণী' বইটি ইংরেজ তার ক্ষমতার বলে ১৯৩১-এ বাজেয়াপ্ত করে। ইংরেজ আজ বিতাড়িত, নজরুলও আজ পরলোকগত। তবুও অমর তাঁর সেই বই এবং বই-এর প্রত্যেক কবিতা। ষড়যন্ত্রের শিকার হতে হয়েছিল ঐ বইটিকেও।

১৯৩১-এ আর একটি বই বাজেয়াপ্ত হয়—শ্রীব্রজবিহারী বর্ম্মন রায় প্রণীত 'তরুণ বাঙালী'। কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'কালের ভেরী' বইটি ইংরেজের শক্তিতে বন্ধ হতে বাধ্য হয় ঐ বছরেই। কবি কিন্তু মানুষের মনে আজও জীবন্ত।

কবি মুকুন্দ দাসের 'কর্মক্ষেত্র' নাটক আজ নিহত। তাঁর 'মাতৃপূজা' বইটি বাজেয়াপ্ত হয় এবং তাঁকে কয়েক বছর জেলও খাটতে হয়। ইংরেজদের বিরুদ্ধে বই লিখলে ইংরেজের রাগ হবে বৈকি? গরীব কবির কবিতার একটু নমুনা দিচ্ছি—

"মেয়েদের এই সব হাই স্কুলে, মা হবে না কোন কালে,
তাই তোরা ভাই সবার আগে মায়ের মন্দির গড়ে তোল।
গার্গী, লীলা, খনার দেশে কাপড় হ'ল গাউন শেষে,
এসব দেখেশুনে অন্ধের মত খাঁটি দুধে ঢালছিস ঘোল...॥"

বীর কবি নজরুলের একটি নয়, অনেক বই বাজেয়াপ্ত হয়েছে। যেমন 'ভাঙার গান', 'বিষের বাঁশী', 'চন্দ্রবিন্দু' প্রভৃতি। তাতে জনসাধারণ অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। সবাই বুঝতে পারে কবির প্রত্যেক বই বাতিল করা হবে—উদ্দেশ্য, কবিকে লেখার জগৎ থেকে সরিয়ে দেওয়া। তখন ইংরেজরা জনসাধারণের উত্তেজনা দেখে ১৯৪৫-এর ৩০শে নভেম্বর ঐ নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়।

সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'রক্ত রেখা' ১৯২৪ সালে বাজেয়াপ্ত হয়। কালীকিঙ্করের 'মন্দিরের চাবি' ১৯৩২ সালে বাজেয়াপ্ত হয়। নগেন্দ্রনাথের লেখা ছোট ছোট কয়েকটি পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত হয়, যেমন 'দেশভক্ত', 'ফাঁসী, 'রক্তপতাকা', 'শোকসিন্ধু' প্রভৃতি। প্রতাপচন্দ্র মাইতির লেখা 'স্বরাজ সঙ্গীতে'র দ্বিতীয় খণ্ড বাজেয়াপ্ত হয়। বিমলা দেবীর 'শিখিপুঞ্জ' বাজেয়াপ্ত হয়। সুরেন্দ্রনাথের 'হোল কী!' এবং মনোজমোহন বসুর লেখা 'যুগাবতার গান্ধীজী' ১৯২১-এ বাজেয়াপ্ত হয়। এগুলো পড়ার সময় মনে রাখা দরকার লেখকগণ অমর রয়েছেন বলেই আজও তাঁদের নাম আপনারা চোখের সামনে পড়ছেন; যেসব বই বাজেয়াপ্ত হয়নি সেইসব বই-এর হাজার হাজার লেখকই বরং কালের অতীত স্রোতে হারিয়ে গেছেন, তলিয়ে গেছেন কিংবা ভেসে গেছেন। অনেককে কেউ হয়তো সহজে খুঁজে পাবেনা আর।

১৯৩৪-এ 'মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার মহত্ব' বইটি বাজেয়াপ্ত হয়। 'কমরেড অবনী মুখার্জীর জীবনী' যার লেখক রাখালচন্দ্র ঘোষ, বইটিও বাজেয়াপ্ত হয়। 'অগ্নিমন্ত্রে নারী' ও 'ভাঙার পূজারী' বইদুটি সান্ত্বনা গুহর লেখা। এই বই দুটিও বাজেয়াপ্ত হয়েছে। দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর লেখা 'প্রণব' বইটিও বাজেয়াপ্ত হয়।

মতিলাল রায়ের 'কানাইলাল' বইটি ১৯২৯-এ বাজেয়াপ্ত হয়। ব্রজবিহারী বর্মনের লেখা 'শহীদ ক্ষুদিরাম বসু' বইও বাতিল হয়। চারুবিকাশ দত্তের লেখা 'রাজদ্রোহীর জবানবন্দী' বইটিও বাজেয়াপ্ত হয়। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার-এর সম্পাদনায় যখন আনন্দবাজার পত্রিকা বের হোত তখন ১৯২৯ এর ২৯শে ডিসেম্বরের আনন্দবাজার পত্রিকাখানি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। তাতে আনন্দবাজার মরেনি, যারা মারতে চেয়েছিল তারাই মরেছে। ঐ সম্বন্ধে যে গেজেট বের হয়েছিল তা হচ্ছে এই —Ananda Bazar Patrika, dated 29-12-1929 Bengali newspaper, printed at the Sree Gauranga Press, 71/1 Mirzapur Street, Calcutta, edited and printed by Satyendranath Majumdar, Bengal No. 15649 P. dated 31-12-1929 (Govt. of Bengal / Political Dept. Gazette). তাছাড়াও আনন্দবাজারের ১১-১২-১৯৪৬, ২৪-১-১৯৪৭, ১-২-১৯৪৭ এবং ৪-৪-১৯৪৭ সংখ্যাও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। আনন্দবাজারের উপর আইন প্রয়োগ করে লাভ এবং ক্ষতি কার কতটা হয়েছে? যারা শক্তি প্রয়োগ করেছে তারা পরাজিত, আনন্দবাজার জীবিত এবং সেদিনের থেকে আজ আরও বহুল প্রচারিত ও সম্প্রসারিত।

কংগ্রেস নেতা জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর লেখা 'দেশের ডাক', 'বিপ্লবী বাংলা' এবং 'বিলাতি বস্ত্র বর্জন করিব কেন?' এই বই তিনটিও বাজেয়াপ্ত হয়।

কমরেড নারায়ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের 'শ্রী ভাঁওতা' বইটি ইংরেজ বাজেয়াপ্ত করে। বইটিতে সরকারের ভাঁওতার গোপনতথ্য ফাঁস হয়েছিল। জীতেশচন্দ্র লাহিড়ীর লেখা 'বিপ্লবী বীর নলিনী বাগচী' বইটিও বাজেয়াপ্ত হয়। ছোট গল্পের দুটি বই বাজেয়াপ্ত হয়—একটি ভুপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত অপরটি মণীন্দ্র নারায়ণ রায়ের। মণীন্দ্র রায়ের 'ককোরী ষড়যন্ত্র' বইটিও ১৯৩৬-এ বাজেয়াপ্ত হয়।

আসিরুদ্দিন ও আব্দুস সামাদ লিখিত 'হজরত আলী ও বীর হনুমানের লড়াই' বইটি বাজেয়াপ্ত হয়। কারণ তাতে ইংরেজের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ করে কটাক্ষ করা হয়েছিল। আবু তাহেরের 'সত্যের আলো' বইও বাজেয়াপ্ত হয়।

খন্দেকার আইনুল ইসলাম লিখিত 'গরু ও হিন্দু মুসলমান' বইটিও বাজেয়াপ্ত হয়। মুসলমানদের অজস্র বই বাজেয়াপ্ত হয়েছে, যার বেশির ভাগই অবাংলা ভাষার বই, অর্থাৎ উর্দু ও ফারসী ইত্যাদিতে লেখা। হজরত মওলানা হুসাইন আহমাদের একাধিক পুস্তক পুস্তিকাও বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

বাজেয়াপ্ত হওয়া 'ইতিহাসের ইতিহাস' বাংলা বই, তাই বাংলা বই নিয়েই মাথা ঘামানো ভাল। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' বইটি বাতিল হয়। ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করে। কথাশিল্পী খুব দুঃখ পান। অনেককে সুপারিশ করেন যাতে তাঁর ঐ বই মুক্তি পায়। এমনকি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে তিনি অনুরোধপত্র দেন যাতে তাঁর ঐ বই-এর উপর থেকে ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত-আইন তুলে নেয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা কী ছিল তা এখন আলোচনা করছি না, পরেই হবে। ঐ বইটি বাতিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্র কেমন যেন অস্বাভাবিক হয়ে পড়েন। সেই সময় অলবেঙ্গল লাইব্রেরি এ্যাসোসিয়েশনের প্রথম অধিবেশন হচ্ছিল, তখন লেখক কী বলেছিলেন একটু চিন্তা করা দরকার। উদ্ধৃতি দিচ্ছি শিশির করের লেখা থেকে—"আচ্ছা তোমাদের এটা তো সারা বাংলার লাইব্রেরীর ব্যাপার। তোমরা একটা কাজ করনা, আর তোমাদেরই তো এটা কাজ। এই যে সরকার আমার 'পথের দাবী'কে আটকে রেখেছে, এটা ছাড়াবার একটা প্রস্তাব সভা হতে মঞ্জুর করাতে পার না? প্রকাশ্য সভা থেকে এর একটা প্রতিবাদ হলে অনেক কাজ হবে—সরকারের টনক নড়বে। আমার আর পাঁচখানা বই যদি সরকার বাজেয়াপ্ত করত তাহলে আমার এত দুঃখ হত না।"

দুঃখের বিষয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর সেই বইটির শুভমুক্তি দেখে যেতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারি আলবার্ট হলে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয় এবং 'পথের দাবী' বইটির উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার জন্য দাবী জানানো হয়। প্রস্তাব করেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও বঙ্কিম সেন ঐ প্রস্তাব সমর্থন করেন। 'শেরে বাংলা' বলে

পরিচিত ফজলুল হকের মন্ত্রিত্বকাল চলছিল সেই সময়। বাংলা ১৩৪৬-এর বৈশাখ মাসে মওলুবী মন্ত্রী ফজলুল হকের সময়ে দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হয়। এজন্য ফজলুল হক অমর।

এখন ইংরেজ নেই, আছে ভারতের দেশীয় সরকার ও রাজ্য সরকার। কেন্দ্রে কংগ্রেস এবং রাজ্যে বামফ্রন্ট—বিশেষ করে কমিউনিষ্ট সরকারেরই প্রাধান্য রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে।

'ইতিহাসের ইতিহাস' বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল, আমি কিন্তু কোন আন্দোলন বা অনুরোধের সুচেষ্টা ও কুচেষ্টা কিছুই করিনি। একদিন হঠাৎ আমায় ডেকে পাঠালেন একজন আইনবিদ্, যিনি হাইকোর্টে প্রাকটিস করতেন এবং বিধানসভার প্রাক্তন সদস্য। তিনি বললেন, 'আমি আপনাকে ডেকেছি এই জন্য যে বইটি হিন্দু মুসলমানের একটি মূল্যবান সম্পদ। এটাকে না বুঝে দু'একটা সাপ্তাহিক পত্রিকার উপর নির্ভর করে বন্ধ করে দেওয়া হল।' অবশ্য তাঁদেরও গোটা বইটা পড়া ছিলনা। উকিল সাহেব বইটি যেভাবে হোক মন দিয়ে পড়ে বললেন, 'যদি আইন বলে কিছু থাকে তাহলে এই বই বন্ধ হতে পারে না। আমি আপনাকে আইনজীবী হিসেবে টাকা রোজগারের জন্য ডাকিনি। আমি জাতীয় সম্পদ এবং দেশের ভাবীকালের ইতিহাস লেখার ইন্ধন বাঁচিয়ে রাখতে চাইছি। সুতরাং কেস করা দরকার।' ওদিকে বাংলাদেশ হতে সংবাদ এল বইটি তাঁরা ছাপতে চান। হয়ত আমার হাতে তাঁরা দিতেন রয়েলটির মোটা টাকা। কিন্তু আমি নানা দিক ভেবেচিন্তে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম। মেদিনীপুর জেলা থেকে প্রস্তাব এল; এই বই-এর মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত আমরা আন্দোলন করব, রাজপথে বাস ট্রাক আটকে দেবো। আমি তাঁদের নিষেধ করে ফিরিয়ে দিলাম। নদীয়া জেলার নবীন ও প্রবীণ বন্ধুরা চিঠি দিলেন। আলোচনা করতে সেখানে গেলাম। কালীপূজোর দিন তাঁরা পাগলাচণ্ডির কাছে কলকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যারিস্টার শঙ্কর দাস ব্যানার্জীর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। তাঁর বিরাট বাড়ি আর বাগান দেখে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল মনে পড়লো। বহু একর জমির উপর বিরাট বাড়ি এবং একদিক জলাশয় দিয়ে ঘেরা। ফুলের বাগানের নৈপুণ্য সহজেই ভাবান্তর ঘটায়। তাঁর বাড়িতে সেদিন খুব ঘটা করে কালীপূজো হচ্ছিল, তবুও আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন তিনি। কারণ যে সাত আট জন ব্যক্তি আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন তাঁরা তাঁর পার্টির কর্মী। তিনি বললেন, 'এমন কেস আমার জীবনে আমি কখনো করিনি। তবে পার্লামেন্ট থেকে বই বন্ধ হয়ে আবার তা চালু হয়েছে এমন নজিরও আছে। আমি কয়েকদিন পর কলকাতা যাব এবং কেসটি সম্বন্ধে বলব কী করা যাবে।' ঠিক কয়েকদিন পর আমার সঙ্গীরা কলকাতা গেলেন এবং আলোচনা হল, তাতে শ্রী ব্যানার্জী বললেন, 'এই কেস করা আমার পক্ষে এখন অসুবিধা, তবে আমি পরামর্শ দিচ্ছি বর্তমান বিধানসভার সদস্য শ্রী ভোলা সেনকে দিয়ে এটি করানো ভাল হবে।'

যাইহোক, চারিদিক থেকে পত্র আসছে, এগিয়ে চলুন, অর্থের প্রয়োজন হয় জানান, রক্তের প্রয়োজন হয় জানান। রক্তের প্রয়োজন হলে তাতেও তাঁরা প্রস্তুত।

আমি কারও কাছ হতে একটি পয়সাও চাইনি। এবং কাউকে ও পথে যেতেও দিইনি।

এখন বইটিতে কী আছে, কী নেই, তার একটু আলোচনা করা যাক। অত্যন্ত দুঃখের কথা, বড় লজ্জা ও পরিতাপের কথা, বইটিতে যে দুর্লভ তথ্য আছে তা তাঁরা জানতে পারেন নি যাঁরা বইটি পড়ে নি। আর বইটাতে যা নেই বা যা বলতে চাওয়া হয়নি তাই প্রচার করা হল সরকারিভাবে। কেউ লিখলেন, লেখকের মাথা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গর্দান হতে নেমে যেত যদি এটা ভারত না হয়ে বাংলাদেশ, ইরান, ইরাক হোত ইত্যাদি। কেউ লিখলেন, লেখককে অবিলম্বে গ্রেফতার করা উচিত। অবশ্য আনন্দবাজার নীরব ছিল। বাকী বড় পত্রিকাগুলোও কোন অশ্লীল মন্তব্য করে নি। তবে তাঁরা সরকারের পক্ষ হতে যে প্রেসনোট পেয়েছিলেন তাই ছাপতে বাধ্য হয়েছিলেন।

যে পত্রিকাটি বিধানসভার বিধান ওলট পালট করেছে তার সম্পাদকের নাম লিখতে ঘৃণাবোধ নয় বরং লজ্জাবোধ করছি, কারণ তিনি যে একজন বড় মিথ্যাচারী তা সকলে জেনে যাক—এটা একটু গোপন রাখাই ভাল ছিল। উপায় নেই তাই নাম লিখতে হচ্ছে। আমার বইটি বাজেয়াপ্ত হওয়ার জন্য এম. এল. এ. ও মন্ত্রীদের খুব দোষারোপ করতে পারছি না এইজন্য যে, আমারও একটা ত্রুটি আছে সেটা হচ্ছে, বইটি খণ্ড খণ্ড নয়, ছোট নয়, একেবারে কিছু কম হাজার পৃষ্ঠার বই। এত মোটা বই পড়বার সুযোগ আর সময় মন্ত্রী ও রাজনীতিবিদদের কোথায়? তার চেয়ে যে পত্রিকা সামনে এসেছে তাই বিশ্বাস করেই তাঁরা কাজের কাজ ফায়সালা করে দিয়েছেন।

২৪পরগণার বসিরহাট টাউন স্কুলের আকার ও ছাত্র শিক্ষকের পরিমাণ প্রায় কলেজের মত। সেখানকার শিক্ষক গোলাম বারীকে কেন্দ্র করে গণ্ডগোল সৃষ্টি হয় এবং এম.এল.এ. ও থানা পুলিশ হয়ে একেবারে বিধানসভা—তারপর হয় বই বাজেয়াপ্ত।

ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা দরকার ছিল। তাই সেখানে গিয়ে পৌঁছালেন আমার এক বিশিষ্ট বন্ধু। তিনি গিয়ে অনেক মানুষের কাছে যা পেলেন সে তথ্যগুলো এই রকম—একজন ইংরাজীর অধ্যাপক নাম গোলাম বারী, তিনি বসিরহাট কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে অন্য সুবিধার কথা চিন্তা করে বসিরহাট স্কুলে শিক্ষকতা করছিলেন। তিনি যে অত্যন্ত যোগ্য তাতে কারো সন্দেহ নেই। এদিকে হেডমাষ্টার সত্যেনবাবুর বয়স শেষ হয়ে আসছিল। তাঁর রিটায়ার হওয়ার সময় আগত। মনে হয়, হেডমাষ্টার হওয়ার ইচ্ছা গোলাম বারী সাহেবের ছিল। সেইজন্যই কলেজ ছেড়ে তাঁর স্কুলে আসা। সত্যেনবাবুর সময় শেষ, সেটা তিনি জেনেশুনেই এসেছেন। কিন্তু কোন মুসলমান বসিরহাট টাউন স্কুলে হেডমাষ্টারী করবেন—এটা প্রায় অসম্ভব। তাই তাঁকে সরাবার চক্রান্ত হয়। তাঁর উপর অভিযোগ, স্কুল লাইব্রেরিতে বহু বই-এর মধ্যে 'ইতিহাসের ইতিহাস' স্থান পায় আর ঐ বই গোলাম বারী সাহেবের হাত দিয়ে

কেনানো হয়। অভিযোগ করা হয়, তিনি ক্লাশে ইতিহাস পড়ান অথচ তিনি ইংরাজীর শিক্ষক। এই বলে ছাত্রদেরও আন্দোলন শুরু করানো হয়। গোলাম বারী সাহেবকে ঘেরাও করে তাঁকে কিছু মারপিটও করা হয়। তখন থানা থেকে পুলিশ এসে তাঁকে উদ্ধার করে বাড়ি পাঠায়। শিক্ষকদের দিয়ে বলানো হয় গোলাম বারী থাকলে আমরা চাকরি করব না। ছাত্ররাও শেখানো শ্লোগান তোলে। এমনি করে পথের কাঁটা গোলাম বারীকে ছুটি নিতে বাধ্য করা হয়। তিনি বর্তমানে একটি হাই স্কুলের হেডমাষ্টার হয়ে চুপচাপ বসে রয়েছেন।

একটি ছোট্ট কাগজের সম্পাদক শেখর বেরা। সাপ্তাহিক পত্রিকাটির নাম 'বহ্নিবার্তা।' প্রথম পাতায় বড় বড় হরফে ছাপা—"ও মশাই জানেন স্কুলে এখন কি পড়ানো হয়?" ৩০ শে জুলাই ১৯৮১-র কাগজ সসম্মানে এম. এল. এ.-এর মাধ্যমে একেবারে বিধানসভা। চলছিল তখন অধিবেশন। এক ঢিলে দুই পাখি।

নিরপেক্ষ শিক্ষিত পাঠক পাঠিকাদের নিকট কতকগুলো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ঘটনা বা রটনা তুলে ধরছি। এগুলো চোখ বুলিয়ে শুধু নয়, মন বুলিয়ে বুঝে নেওয়ার অনুরোধ রাখছি। শেখর বেরার কাগজে লেখা হয়—

১। "ও মশাই জানেন স্কুলে এখন কি পড়ানো হয়?"

২। 'ইতিহাসের ইতিহাসে' গোলাম মোর্তজা বলেছেন, "বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক নন, তিনি ফেল করেছিলেন। দ্বিতীয় বছর ইংরেজ সরকার দয়া করে তাঁকে পাশ করিয়ে দিয়েছিলেন।"

৩। "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বর্ণপরিচয়' তাঁর নিজের রচনা নয়, তিনি কোন এক মুসলিম লেখকের লেখা থেকে আত্মসাৎ করেছেন।"

৪। "বেদ না পড়লে হিন্দু হওয়া যায় না।"

৫। "স্বামী বিবেকানন্দ বিদেশে ধর্ম প্রচারে যান নি, গিয়েছিলেন অর্থ ও রুটি সংগ্রহের জন্য।"

৬। "ইংরেজের ওষুধ খাওয়া বঙ্কিম যেমন দেশ ও সরকারকে দেবতার আসনে বসিয়ে দেশবাসীকে ভেড়ায় পরিণত করতে চেয়েছিলেন, বিবেকানন্দও যা বলেছিলেন তাতে সেই গন্ধই পাওয়া যায়।" "তিনি আমেরিকা হতে লণ্ডনে যান অর্থাৎ তখনকার মনিবের দেশ, সেখান থেকে নিয়ে আসেন মিস্ মার্গারেট নাম্নী এক সুন্দরী রমণী।"

এই কথাগুলো পড়লে স্বভাবতই লেখকের উপর ক্রোধ, দুঃখ, অভিমান, ঘৃণা সব কিছুরই উদ্রেক হতে পারে। কিন্তু কিভাবে বিকৃত করা হয়েছে তা লক্ষ্য করলে সেই অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে ঐসব ষড়যন্ত্রকারী এবং সম্পাদকের উপর ঘৃণায় মন বিষিয়ে উঠবে।

কোটি কোটি জনসাধারণ এমনি পচাটে খবরের কাগজ আর বেতারের সংবাদে

লেখকের প্রতি রুষ্ট হয়েছেন, তাতে আমার তত দুঃখ নেই, তাঁরা অনেকে সাধারণ মানুষ। কিন্তু লাখ লাখ মানুষের নির্বাচিত ও নির্ধারিত বিধানসভার সদস্য যাঁরা, তাঁরা প্রকৃত তথ্য জানবার চেষ্টা করলেন না কেন? করেছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু একথা কেন ভুলে গেলেন যে, সরষের ভিতরে ভূত থাকে। যাঁদের দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাঁদের মধ্যে যদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় সাম্প্রদায়িক মনোভাবের মানুষ থাকেন তাহলে সেখানে কি মারাত্মক অবস্থা হতে পারে না? আমাদের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী কমরেড জ্যোতি বসুর সময়ে এত বড় একটা অন্যায় হয়ে যাবে এটা কংগ্রেস কমিউনিস্ট নির্বিশেষে প্রত্যেক নিরপেক্ষ মানুষের কাছে দুঃখজনক।

সম্পাদক শেখর বেরা তাঁর কাগজে পরোক্ষভাবে আনন্দবাজার, যুগান্তর, অমৃতবাজার ও স্টেটসম্যানকে গালি দিয়েছেন। ভাবার্থ হচ্ছে এই—বসিরহাটের খবর আর 'ইতিহাসের ইতিহাস'-এর খবর কোন বড় কাগজ আজ পর্যন্ত ছাপে নি। সেজন্য তাঁর খুব গোঁসা। তাই তিনিই এই মহান কর্মটি সম্পাদন করলেন। তাঁর জানা উচিত ছিল বড় পত্রিকাগুলোর সব কাজে বা লেখায় সকলে সন্তুষ্ট না হলেও তাঁদের মধ্যে অনেক বড় গুণও আছে, তা না থাকলে বড় হওয়া যায় না। শেখর বেরা যেভাবে আমাকে বা আমার প্রতি অশ্লীল উক্তি করেছেন আমি তা খুলে খুলে প্রকাশ করছি না।

জনসাধারণ এবং ভারতের লোকসভার সম্মানীয় সদস্য ও বাংলার বিধানসভার সম্মানীয় সদস্যবৃন্দ এবং বিভাগীয় সম্মানীয় কর্মীবৃন্দ আর বর্তমান ও আগামীকালের পাঠক-পাঠিকাদের নিকট আমার বন্দী বই-এর বন্দী হওয়ার কারণগুলো চিন্তার খোরাক হিসেবে পরিবেশন করে যাচ্ছি।

বিধানসভায় আলোচিত শেখর বেরার প্রথম কথা—"ও মশাই জানেন, স্কুলে এখন কি পড়ানো হয়?"

উত্তর [১] ঃ এই ১৯৮১তে সারা ভারতের কোন স্কুলেরই পাঠ্যপুস্তক ছিল না বইটি। অন্ততঃ এটা বিধানসভা ও লোকসভার সদস্যদের জানা উচিত ছিল। একথা যুগান্তর ও অমৃতবাজার পত্রিকায় ছাপা হলেও যারা এই সংবাদ পাঠিয়েছে তাদের সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা। ঐ বই ভারতে কোনদিন কোন স্কুলেরই পাঠ্যপুস্তক ছিল না। যদি তা প্রমাণিত হয়, তাহলে আমার সততা ও সত্যতার কোন মূল্যই থাকবে না।

দ্বিতীয় অভিযোগ—আমি নাকি লিখেছি, "বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক নন। তিনি ফেল করেছিলেন, দ্বিতীয় বছর ইংরেজ সরকার দয়া করে তাঁকে পাশ করিয়ে দিয়েছিলেন।"

উত্তর [২] ঃ সকলে বজ্রকঠিন দৃষ্টি দিয়ে দেখুন, 'ইতিহাসের ইতিহাসে' প্রথম মলাটের কাগজ থেকে শেষ মলাটের কাগজ পর্যন্ত ছাপা অক্ষরে যদি ঐ কথা থাকে তাহলে সরকারি আইনে যে কোন শাস্তি নেওয়ার জন্যে আমি নিজেই আগ্রহী।

অর্থাৎ এই তথ্য ঐ বই-এ আছে বলে যাঁরা লিখেছেন তাঁরা একশত ভাগই অসত্য লিখেছেন। এবার ভেবে দেখুন, আমার পক্ষ হতে যদি এগুলো জানাতে না পারা যেত তাহলে সাধারণ মানুষের ধারণার কি পরিবর্তন হোত?

শেখর বেরার তৃতীয় অভিযোগ—"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বর্ণপরিচয়' তাঁর নিজের রচনা নয়, তিনি কোন এক মুসলিম লেখকের লেখা হতে আত্মসাৎ করেছেন।"

উত্তর [৩] : 'ইতিহাসের ইতিহাসে' শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোন স্থানে একথা আদৌ নেই। আমার আর কী বলার থাকতে পারে? হয়ত অনেকে উত্তেজিত হয়ে মনে মনে ভাবতে পারেন, তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করা হোক। কিন্তু কী ফল হবে? কোর্টে তিনি কৈফিয়েৎ দেবেন, 'আমাকে যিনি তথ্য পাঠিয়েছেন তাঁর নাম মিঃ ফক্স, আমি তাই ছেপেছি। এখন আমি ঐ ভুল তথ্য পরিবেশনের জন্য ভুল স্বীকার করছি'। তাতে কী লাভ হবে? ঐ চরিত্রের কি পরিবর্তন হবে?

চতুর্থ অভিযোগ—'ইতিহাসের ইতিহাসে' নাকি আছে "বেদ না পড়লে হিন্দু হওয়া যায় না।"

উত্তর [৪] : কথাটি ছোট্ট হলেও খুব মারাত্মক। ভারতে বেদ পড়া ব্রাহ্মণ সংখ্যায় ক'জন আছেন? বেশির ভাগই বেদ না পড়া হিন্দু। সুতরাং সহজেই তাঁরা উত্তেজিত হয়ে বলতে পারেন—তাহলে লেখক আমাদের অহিন্দু বলতে চান? কিন্তু জেনে রাখুন, আমার বই-এর কোথাও এরকম কথা আদৌ লেখা নেই।

পঞ্চম অভিযোগ—আমার বই-এ নাকি লেখা আছে, "স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা ধর্মপ্রচারের জন্য যাননি, গিয়েছিলেন অর্থ ও রুটি সংগ্রহের জন্য।" আরও নাকি লেখা আছে, "ইংরেজের ওষুধ খাওয়া বঙ্কিম যেমন দেশ ও সরকারকে দেবতার আসনে বসিয়ে দেশবাসীকে ভেড়ায় পরিণত করতে চেয়েছিলেন, বিবেকানন্দও যা বলেছিলেন তাতে সেই গন্ধই পাওয়া যায়।" এও নাকি লেখা আছে, "তিনি আমেরিকা হতে লণ্ডনে যান অর্থাৎ তখনকার মনিবের দেশ, সেখান থেকে নিয়ে আসেন মিস্ মার্গারেট নাম্নী এক সুন্দরী রমণী।"

উত্তর [৫] : এই উদ্ধৃতিগুলোও সঠিক নয়, এক বিশেষ নোংরা উদ্দেশ্যে বিকৃত। উপরের উদ্ধৃতি আমার ঐ গ্রন্থে ঐভাবে নেই। অবশ্য যেভাবে আছে তাও তুলে ধরছি।

'ইতিহাসের ইতিহাস'-এ স্বাধীনতার অধ্যায় অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। বহু হিন্দু-মুসলমান যোগ্য মানুষ শহীদ হয়েছেন তাঁদের নাম-গন্ধ চলতি ইতিহাসে নেই। যে সমস্ত নাম ও তথ্য পাওয়া যায় না সেগুলো ঐ পুস্তকে লেখা হয়েছে। আবার যাঁরা স্বাধীনতা চাননি তাঁরাই স্বাধীনতার ইতিহাসে বেশি পরিমাণে 'হীরো' হয়ে রয়েছেন—সে কথাও লেখা আছে।

কেউ ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন আবার কেউ স্বাধীনতার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। আমাদের চলতি সাধারণ পাঠ্য ইতিহাসে এগুলোকে একাকার করে দেওয়া

হয়েছে। আমি কিন্তু তা পৃথক করে দিয়েছি। তাছাড়া সাধু সন্ন্যাসীরা রাজনীতি নিয়ে খুব বেশি অনেকেই মাথা ঘামান নি, যেমন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।

উদ্ধৃতিগুলো দিয়ে প্রমাণ করানোর অপচেষ্টা হয়েছে আমি নাকি অমুসলমান বিদ্বেষী। আর বিদ্বেষী বলেই মুসলমান দরদী হতেই হবে এবং মুসলমানদের জন্য অন্যায় করেও দালালি করতে হবে, এটাই স্বাভাবিক। এও স্বাভাবিক যে হিন্দু বিদ্বেষী কখনও হিন্দুর চাপা পড়া গৌরব তুলে ধরতে চাইবে না। কিন্তু যাঁরা ঐ বইটি পড়েছেন তাঁরা জানেন আমি অনেক মুসলমানের বিরুদ্ধেও অপ্রিয় সত্য তথ্য পেশ করেছি, যেমন জিন্নাহ। আবার স্বাধীনতার ইতিহাসে চাপা পড়েছে যাঁদের নাম তাঁদের জন্য আমি শক্ত হাতে কলম ধরেছি, যেমন শরৎচন্দ্র। যদি আমি উপরোক্ত দোষে দোষী হোতাম তাহলে স্যার সৈয়দ আহমাদের বিরুদ্ধে একটুও লিখতে পারতাম না অথবা সুভাষ বসুর পক্ষে এত তথ্য সংগ্রহ করা ও প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব হোত না।

প্রসঙ্গতঃ জানিয়ে রাখি ওটা সাধারণ পাঠ্যপুস্তক নয়। গবেষণামূলক উদ্ধৃতিবহুল গ্রন্থ। বইটি খুললে প্রথমেই সেকথা পাওয়া যাবে—'ইতিহাসের ইতিহাস'-এর ঠিক নিচেই লেখা আছে 'গবেষণামূলক, উদ্ধৃতি ও তথ্যবহুল গ্রন্থ'।

স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকা যাওয়ার ব্যাপারটা আসলে যে টাকা আনতে যাওয়া তা সহজে কেউ বিশ্বাস করবেন না। আর আমেরিকার চিকাগোতে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতে টাকা ও রুটির কথাই মুখ্য ছিল—তাও বিশ্বাস করা মুশকিল। তাই প্রমাণের জন্য উদ্ধৃতি দিচ্ছি—"সতের দিন ধরে অনুষ্ঠিত ঐ সম্মেলনের উদ্বোধন অধিবেশন ও বিভাগীয় অধিবেশনগুলিতে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতাগুলোতে এ কথাই সবচেয়ে বেশি ফুটে ওঠে, ধর্ম নয় রুটিই ভারতীয়দের সর্বাগ্রে প্রয়োজন।" আমার লেখা উপরের কথাটিও বিশ্বাস করা সত্যিই কঠিন। উদ্ধৃতিটা পড়ে যদি অবিশ্বাস ও ক্রোধের উদ্রেক হয় তাহলে বলি, শেখর বেরার দলবল কি উদ্ধৃতির ঠিক নিচের লেখাগুলো পড়তে পারেন নি? নাকি জনসাধারণকে ইচ্ছা করে জানাননি? এখন আমি লেখক নিজেই জানাচ্ছি, ঐ উক্তিটি যে বই হতে নেওয়া হয়েছে সেটা একটা দু-চার পয়সার দু-দশ পাতার পুস্তিকা নয়, আর তার লেখক ভারতের হতভাগ্য কোন মুসলিমও নন। ৪৯৯ পৃষ্ঠার ঐ বইটির নাম 'বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা', লেখক সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। উদ্ধৃতির পৃষ্ঠা নম্বর ২২৫। বইটি ছাপা হয়েছে ১৯৬৮ তে। এতেও যদি ষড়যন্ত্রের শিকার হতে হয় তাহলে ভারতের বড় বড় লাইব্রেরিগুলো, যেগুলো অতীতে ও বর্তমানে জ্ঞান পরিবেশন করে আসছে বা আগামীতেও করতে থাকবে সেগুলো রেখে লাভ কি? সব আগুনে পুড়িয়ে দেওয়াই ভাল।

বিবেকানন্দ যে একজন সাধারণ মন্ত্র পড়া সাধু ছিলেন মাত্র, তা মোটেই নয় বরং তিনি ছিলেন আধুনিকবাদী—এটা কি আমার লেখায় ফুটে ওঠে নি? যেন আমার ঐ

বই-এর মধ্যে ৭০০ পৃষ্ঠায় বিবেকানন্দের জন্য লিখেছিলাম—"বিদেশী শাসন উচ্ছেদ করার জন্য আমি ভারতীয় নৃপতিদের নিয়ে একটি শক্তি জোট করতে চেয়েছিলাম। সেইজন্য আমি হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত দেশের সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছি। সেইজন্যই আমি বন্দুক নির্মাতা স্যার হাইরাম মাক্সিমের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলাম কিন্তু দেশের কাছ হতে আমি কোন সাড়া পাইনি। দেশটা মৃত।" যদিও আমার বইয়ে এই কথাটি লেখা আছে তথাপি জানাচ্ছি ওটা উদ্ধৃতিই। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'স্বামী বিবেকানন্দ' পুস্তকের ১০৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য—ওখানে যা আছে আমার বই-এ ৭০০ পৃষ্ঠার অষ্টম লাইনে তাই-ই লেখা আছে।

যদি বিবেকানন্দকে সত্যবাদী মনে করা হয় তাহলে একথা ভাবা কি ভুল হবে যে, সেই সময়ে ভারতের সমস্ত নৃপতি বা রাজারা ইংরেজকে তাড়াতে চাননি, ফলে তিনি কোন সহযোগিতা পান নি। আর যদি এ তথ্য নির্ভুল না হয় তাহলে বিবেকানন্দের কথা সত্য হয়ে ওঠে না।

আগেই বলে দিয়েছি এ বই গবেষণামূলক অর্থাৎ গবেষণার বিষয়। আমার পুস্তকের ৬৯৯ পৃষ্ঠায় আছে, "আসলে তিনি সেকালের ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত; বি. এ. পাশ করেছিলেন। এবং ইংরেজকে সরানো যায় কিনা তার জন্য হাবভাব বুঝতে সারা ভারত ঘুরলেন।"

যাঁরা শেখর বেরার মতো আমাকে স্বামীজী বিরোধী মনে করেছেন, তাঁরা মনে রাখবেন কাগজে যা লিখেছি সেগুলো কি আমার তৈরি, না কি আমার আদেশে হিন্দু মনীষীদের দিয়ে লিখিয়েছি? স্বামীজীর আমেরিকা যাওয়ার উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে বলেছিলেন, "দেখ ভাই, এদেশে যেরকম দুঃখ দারিদ্র্য এখানে এখন ধর্ম প্রচারের সময় নয়। যদি কখনও এদেশের দুঃখ দারিদ্র্য দূর করতে পারি, তখন ধর্মকথা বলব। সেইজন্য কুবেরের দেশে যাচ্ছি, দেখি যদি কিছু উপায় করতে পারি।" আমার বই-এ এটা ৭০০ এবং ৭০১ পৃষ্ঠায় আছে। কিন্তু ৭০১ পৃষ্ঠার তৃতীয় লাইনে একথা কি লেখা নেই যে সেটা কোন বই-এর উদ্ধৃতি? ওটা স্বামী অখণ্ডানন্দের 'স্মৃতিকথা' পুস্তকের ১০৮ পৃষ্ঠা হতে নেওয়া হয়েছে। শেখর বেরা জানিয়েছেন, আমার বই-এ লেখা আছে "তখনকার মনিবের দেশ, সেখান থেকে নিয়ে আসেন মিস্ মার্গারেট নাম্নী এক সুন্দরী রমণী।" আগেই বলেছি এটা ঐ বই-এ এরকম নেই। কিভাবে বিকৃত করা হয়েছে লক্ষ্য করুন —

"আমেরিকা হতে তিনি লণ্ডনে যান অর্থাৎ মনিবের দেশে, সেখানে একটি সুন্দরী রমণী তাঁর প্রতি মুগ্ধ হন এবং নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদন করেন। সুন্দরীর নাম ছিল মিস্ মার্গারেট নোবল্। তিনিই নিবেদিতা নাম নিয়ে সারা জীবন বিবেকানন্দের সঙ্গে ছায়ার মত ছিলেন। তিনি শিক্ষিতা এবং রাজনীতি সচেতনা নারী সন্দেহ নাই।" মনিবের বলতে আমাদের সকলের মনিব ছিল সেদিন ইংরেজরা, যেদিন আমরা পরাধীন ছিলাম। বৃটিশ ছিল এদেশের প্রভু। তাদের বেশির ভাগই নেতার নামে লর্ড

লাগানো। লর্ড মানে মনিব বা প্রভু। যেমন লর্ড ক্লাইভ, লর্ড হেষ্টিংস, লর্ড ক্যানিং। অতএব 'মনিব' কথা মোটেই ভুল নয়। আর ইউরোপের ঐ তরুণী যে কুৎসিত ছিলেন না, সুন্দরী ছিলেন তাতে আদৌ সন্দেহ নেই। তাছাড়া প্রত্যক্ষদর্শীরা ভালভাবে জানেন, তিনি যুবতী অবস্থায় সুন্দরী ও সুস্থ স্বাস্থ্যের অধিকারিণী ছিলেন। এখানে 'ছায়ার মত ছিলেন' বলতে আমাদের সাধারণ ধারণা, মিস মার্গারেট ও স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধ ছিল গুরুশিষ্যা। কিন্তু এখানে এ অর্থও হতে পারে যে বিদেশীরা স্বামীজীকে প্রচুর টাকা দিয়েছিল সত্যি, আর সেই টাকা তিনি ব্যক্তিগত ভোগে না লাগিয়ে মিশন তৈরি করলেন এও সত্যি। কেননা বিদেশি অর্থদাতাদের অর্থ তাদের স্বার্থের অনুকূলে খরচ হচ্ছে না প্রতিকূলে, তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য হয়ত ঐ বিদেশিনীর ছিল বিশেষ দায়িত্ব। ইংরেজকে তাড়াবার জন্য বন্দুক কিনতে এবং সারা ভারত ঘুরে যিনি নৃপতিদের সাহায্য চাইলেন, তিনি কেন হঠাৎ ঘোষণা করলেন তাঁর মিশনের সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক থাকবে না, অর্থাৎ স্বাধীনতা নিয়ে রাজনীতি করা এই মিশনের কর্মীদের পক্ষে আর সম্ভব নয়। যেহেতু তিনি বলেছিলেন, "The aims and ideals of the Mission being purely spiritual and humanitarian it shall have no connection with politics." এই উদ্ধৃতিও আমার সৃষ্টি নয়—The Life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western Disciples [1960, p. 502] দ্রষ্টব্য।

'রামকৃষ্ণ মিশন মানেই বিলেতি মিশন' এই কথাটি মোটেই কোন জটিলতা বহন করে না। টাকা ছিল বিলেতের, আর সেই টাকাতেই তো তৈরি। স্বামীজীর নিজের টাকা থাকলে ভারতের নৃপতিদের কাছে সাহায্য চাইবেন কেন? আর টাকা আনতে যে আমেরিকা গিয়েছিলেন তা তাঁর লেখাতেই প্রমাণিত। তাছাড়া মিশন শব্দটা বিলেতি শব্দ। এটা না বাংলা, না সংস্কৃত, সুতরাং বিলেতই হচ্ছে তার উৎস।

তিনি যে গোঁড়া ছিলেন না, একথাও আমি 'ইতিহাসের ইতিহাসে' লিখেছি—"...আসলে তিনি তা ছিলেন না অর্থাৎ তিনি গোঁড়া ছিলেন না, বরং প্রগতিবাদী ছিলেন। তাই তিনি গীতা পড়ার চেয়ে ব্যায়াম করা উত্তম মনে করতেন" [পৃষ্ঠা ৭০২] । কিন্তু সেটাও তো আমি অনুমানে বা আন্দাজে লিখিনি। ৭০৩ পৃষ্ঠার প্রথম লাইনে আমি উদ্ধৃতি দিয়েছি, "You will be nearer to heaven through football than through the study of the Gita." [The Complete Works of Swami Vivekananda, 1960, Vol.3. p.242]।

তিনি যে আধুনিকমনা ছিলেন তার অনেক প্রমাণ আছে—তিনি বলতেন, "First bread and then religion"—প্রথমে রুটি পরে ধর্ম। তিনি আরও বলেছেন, "রুটি চাই; যে ঈশ্বর কেবল স্বর্গের চিরন্তন সুখের কথা বলে অথচ রুটি যোগাতে পারে না তার প্রতি আমার কোনও বিশ্বাস নেই" [The Complete Works of Swami Vivekananda, 1955, Vol. 4, p. 368]। তিনি যে রামকৃষ্ণের অন্ধ ভক্ত ছিলেন সে প্রমাণেরও যথেষ্ট অভাব আছে। যেহেতু তিনিই বলেছিলেন, "I am

not a servant of Ramkrishna or anyone, but of him only who serves and helps others without caring for his own Mukti." [দ্রষ্টব্য ঐ পুস্তক, পৃষ্ঠা ৫০৭]

আমরা চলতি ইতিহাসে পড়েছি, নিবেদিতা স্বামীজীর অন্ধ ভক্ত ছিলেন, তিনি মনে প্রাণে তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কিছু এমন তথ্য পাওয়া যায় যাতে বিতর্ক করার সুযোগ আছে।

নিবেদিতার আসল নাম ছিল মিস মার্গারেট নোব্ল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাম দেন 'লোকমাতা', অরবিন্দ ঘোষ নাম দেন 'শিখাময়ী', অবনীন্দ্রনাথ নাম দেন 'মহাশ্বেতা', বিবেকানন্দ নাম দেন 'নিবেদিতা'—এই নামটিই বেশি গ্রহণযোগ্য হয়েছে; গুরুর দেওয়া নাম বেশি মূল্যবান। কবি রবীন্দ্রনাথের মতে, "তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভারতবর্ষের জন্য দান করিয়াছিলেন।" "সার্থক তাঁর নাম 'নিবেদিতা' নামকরণ।" [দ্রঃ জীবন মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'নিবেদিতা ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম', পৃ. ১]

একটু আগেই দেখেছি বিবেকানন্দ আমেরিকা থেকে ফিরে রাজনীতি করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। কিন্তু বিদেশীরা এত টাকা দিয়ে চুপ করে বসে ছিল না, তাঁর গতিবিধি লক্ষ্য রাখত প্রচুর গুপ্তচর। তাছাড়া ইংল্যান্ডের মিসেস্ হ্যামন্ডকে নিবেদিতা যে চিঠি লিখেছিলেন তা থেকে প্রমাণ হয় তিনি চিঠিপত্র নিয়মিত পাঠাতেন। অবশ্য নিজের জন্যও লিখেছেন, "আর আমি এদেশে একজন অতিশয় রাজভক্ত মহিলা।" [দ্রঃ উপরোক্ত, পৃষ্ঠা ৪]

কাশ্মীরে স্বামীজী আর একটি আশ্রম তৈরি করতে এবং তার বিলেতি নাম না দিয়ে 'সংস্কৃত মঠ' নাম দিতে চেয়েছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে কাশ্মীরের মহারাজা যত জমি লাগে তা দান করতেও স্বীকৃত হয়েছিলেন। কিন্তু স্যার এ্যডালবার্ট ট্যালবটের বিরোধিতায় তার বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব হয় নি। [দ্রঃ ঐ বই, পৃষ্ঠা ৪]

নিবেদিতা স্বামীজীর অন্ধ ভক্ত ছিলেন তাতে সন্দেহ আছে বললে অনেকে চটতে পারেন। কিন্তু একথা সত্য যে, নিবেদিতা যদিও ভারতে থাকতেন তথাপি তাঁর হৃদয়ে ছিল স্বদেশ প্রেম। তাঁর উগ্র স্বজাতিপ্রেমকে স্বামীজী একবার ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন, "তোমার এই স্বজাতি প্রেম একপ্রকার পাপ।" [Complete Works of Sister Nivedita, Vol. 1, P. 22]

নিবেদিতা বলেছিলেন, আমার কাছে স্বাধীনতার মূল্য আছে.....। কংগ্রেসকে তিনি নির্বোধ মনে করতেন এবং ক্ষতিকারকও; তবুও কংগ্রেসে যোগদানের চিন্তা তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল [Letter dated 19.7.1901]। "আবার ১৯০১ সালের ৩রা অক্টোবর এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন যে, গত বছর তিনি যেসব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছেন তা তাঁর জন্য স্বামীজী নির্দ্ধারিত পথের বাইরে" [নিবেদিতা ও ভারতের

স্বাধীনতা সংগ্রাম, পৃষ্ঠা ৭]। অতএব নিবেদিতা সর্ববিষয়ে যে স্বামীজীর তাবেদার ছিলেন তা বলা মুশকিল।

স্বামীজী রাজনীতি না করতে ঘোষণা করলেও নিবেদিতা কিন্তু বলেছিলেন, "হিন্দু ধর্মই এখন সবচেয়ে বেশি করে আমার ধর্ম, কিন্তু সেইসঙ্গে রাজনৈতিক প্রয়োজনও খুব স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছি।" [Letter, dated 10th June, 1901].

আমি যে বিতর্কিত কথাটি লিখেছি তার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে পারি, স্বামীজী কেন নিবেদিতাকে স্বাধীন বলে চিঠি দিয়েছিলেন? আর কেনই বা রাজনীতিবিদরা বোসপাড়া লেনে তাঁর বাড়িতে মিটিং করতেন?—"দেশে ও বিদেশে প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, বোসপাড়া লেনে তাঁর বাড়িতে রমেশচন্দ্র দত্ত, গোখলে, আব্দুর রহমান, আনন্দমোহন বসু আনাগোনা করছেন, এছাড়া স্বামীজী নিজেই তাঁকে লিখেছেন যে নিবেদিতা স্বাধীন।" [দ্রষ্টব্য পত্রাবলী ২য় খণ্ড, স্বামী বিবেকানন্দ, কলকাতা ১৩৬৭, পৃষ্ঠা ৪৩৭]

ইতিহাসে লিখতে বাধা থাকলেও 'ইতিহাসের ইতিহাস', 'ইতিহাসের আড়ালে' বা 'ইতিহাসের বাবা' বলে কোন বই-এ যদি এরকম তথ্য পরিবেশন করা হয় তাহলে কি তা গবেষকদের জন্য মূল্যবান সম্পদ নয়? ইতিহাস আর 'ইতিহাসের বাবা' একইরকম হবে এ আশা করা ঠিক হবে না। বাবা ও ছেলের মধ্যে অনেক মিল থাকলেও তা এক নয়। যদি নেপথ্যের কথা চলতি ইতিহাসে না লিখে বিশেষ ইতিহাসে লেখা হয় যে, নিবেদিতা ও স্বামীজীর মধ্যে মনের মিল সর্ববিষয়ে ছিল না বরং নিজ নিজ মতে প্রত্যেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন—তা কি ভুল হবে? যেমন "স্বামীজীকে বলা হয়েছিল, হাঁ আপনি কি বুঝতে পারছেন না? এ জন্যই আমি [নিবেদিতা] বলি যে, অন্য প্রশ্নটির উত্তর সর্বাগ্রে দিতে হবে তারপর শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপার। বলাবাহুল্য সেই 'অন্য' প্রশ্নটি ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা।" [দ্রষ্টব্য নিবেদিতা ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ঃ জীবন মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৮]

উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর স্বামীজী যা দিয়েছিলেন তাতে তাঁদের মনের সন্ধি বিচ্ছেদের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন স্বামীজী বললেন, "তাই হবে মার্গট, বোধ হয় তোমার কথাই ঠিক, কেবল আমার মনে হয় আমি মৃত্যুর নিকটবর্তী হচ্ছি। এই সব জাগতিক ব্যাপারে মনযোগ দেওয়া আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মোটকথা স্বামীজী, নিবেদিতার বুলি আর রাজনৈতিক ভূমিকা মোটেই সমর্থন করেন নি। [Sister Nivedita Pravrajika Atmaprana, Cal. 1967, p. 140]

স্বামীজীর মৃত্যুর পর রাজনৈতিক ভূমিকার উপর নিবেদিতাকে সাবধান করে দেওয়া হয়; যেহেতু স্বামীজী মৃত্যুর পূর্বেই মঠের ও মিশনের সঙ্গে রাজনীতির কোন যোগ থাকবে না বলে ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাই নিবেদিতা মঠ ও মিশন হতে একেবারে পৃথক হতে বাধ্য হন—"স্বামীজীর জীবনকালেই তিনি [নিবেদিতা] রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু স্বামীজীর দেহত্যাগের পর

নিবেদিতার রাজনৈতিক জীবনকে কেন্দ্র করে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিবেদিতার মত পার্থক্য দেখা দেয়। স্বয়ং স্বামীজীই মঠের আদর্শ নিরূপণ করেন যে, রাজনীতির সঙ্গে মঠের কোন সম্পর্ক থাকবে না। ফলে স্বামীজীর মৃত্যুর পর নিবেদিতা মঠের সম্পর্ক ত্যাগ করতে বাধ্য হন"—এই উদ্ধৃতি জীবনবাবুর 'নিবেদিতা ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম' বই-এর ১০ পৃষ্ঠা হতে নেওয়া। মনে করিয়ে দিচ্ছি যে, সেটা স্কুলের পাঠ্য পুস্তক নয়। এরকম ধরণের বই-এর মৃত্যু ঘটানো কোন সভ্য দেশের পক্ষে সঠিক হবে কি? যদি কেউ লেখেন, 'মার্গারেট—না তাঁর চুল ভারতীয় নারীদের মত বড় করলেন, না ভারতীয় বিধবাদের মত মুণ্ডন করলেন, না শাড়ী ব্লাউজ পড়লেন—পুরোপুরিভাবে তিনি ইউরোপীয় ট্রাডিশন কি পছন্দ করে যান নি?' তাহলে কি তাঁর লেখার অপমৃত্যু ঘটানো হবে, যদিও সেটা তথ্যবহুল হয়?

আমরা ইতিহাসে পড়তে ও লেখার সময় লিখতে পারি যে নিবেদিতা ভারতের স্বাধীনতায় উদ্বুদ্ধ করতে এসেছিলেন ভারতের জনসাধারণকে। আর তার জন্য অনেক বক্তৃতা দিয়েছেন, অনেক পত্রিকায় লেখা দিয়েছেন কিন্তু বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যখন বড় বড় নেতারা বঙ্গভঙ্গ রোধ করবার জন্য ১৯০৫ সালের ৭ই আগস্ট কলকাতা টাউন হলে বিদেশী পণ্য বয়কট ও স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহারে শপথ গ্রহণ করেন, সেই বিরাট সভায় নিবেদিতাও ছিলেন। কেননা, তাঁকে বিদেশী বলে সন্দেহ করার অবকাশ তখন বোধহয় ছিল না। কিন্তু ঐ সভায় তিনি কি কোন ভাষণ দিয়েছিলেন? অথবা তাঁর যেসব ডায়েরী পাওয়া গেছে তাতে ঐ তারিখে ভারতের পক্ষে কোন পরিষ্কার মন্তব্য কি লিখে গেছেন?—"এই ঐতিহাসিক সভায় যোগদান করলেও নিবেদিতা এতে কোন ভাষণ দেননি। ঐদিন তাঁর ডাইরীতে ইংরাজীতে লেখা আছে—বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সভা। কালো ছায়া।" [জীবনবাবুর ঐ বই, ১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

শেখর বেরার জেনে রাখা কর্তব্য, কলম চালাতে হলে সততার প্রয়োজন। লেখকের লেখা 'জলখাবার' কে যদি 'খাবারজল' লেখা হয়, তাতে অর্থের আকাশ পাতাল পার্থক্য হয়। কোন লেখকের লেখা যদি এই হয়—"রাম ভারতের চরিত্রবান লোক ছিলেন" কিন্তু তাতে যদি একটি 'ই' যোগ করে দেওয়া হয় তাহলে কোটি কোটি মানুষকে গালি দেওয়া হবে। যেমন, "রাম-ই ভারতের চরিত্রবান লোক ছিলেন।" এর অর্থ হচ্ছে রাম ছাড়া ভারতের কেউ চরিত্রবান নন। কিন্তু ওপর মহলের নেতাদের এ বিষয়ে সজাগ থাকা উচিত। ধরে নিলাম কোন ছোট গল্পের বই-এ পাঁচটি গল্প আছে। তার একটি গল্প আপত্তিকর। তা হলে শুধু সেই গল্পটি পড়লেই যথেষ্ট। কিন্তু অন্যান্য বইগুলো ফুলের মালা গাঁথার মত একটি অক্ষর আর একটি অক্ষরের সঙ্গে, একটি বিষয় আর একটি বিষয়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে পারে। যদি কেউ সম্পূর্ণভাবে 'ইতিহাসের ইতিহাস' নিরপেক্ষভাবে পড়েন আর যদি তাঁর ঐ বইটি পড়বার ন্যূনতম যোগ্যতা থাকে তাহলে তিনি লেখককে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছুক হবেন নিঃসন্দেহে।

এবার শেষের কথাটুকু বলি—ইংরেজের ওষুধ খাওয়া বঙ্কিম দেশ ও সরকারকে দেবতার আসনে বসিয়ে আমাদের ভারতবাসীকে ভেড়ায় পরিণত করতে চেয়েছিলেন। বিবেকানন্দও যা বলেছেন তাতে কিন্তু সেই গন্ধই পাওয়া যায়।

এখানে দুটি বিষয়ে দায়ী বলে যদি ধরে নেওয়া যায় তাহলে এই কথাই দাঁড়ায়, স্বামীজী এবং বঙ্কিমের বিরুদ্ধে আমি অন্যায়, বেঠিক অথবা অসত্য লিখেছি।

আচ্ছা, ঋষি বঙ্কিমের কথা পরেই হবে, প্রথমে স্বামীজীর কথাটা শেষ করি। ভারতের যে সমস্ত নবীন ও প্রবীণরা ইংরেজ তাড়াও আন্দোলন করলেন, জেলে ঢুকলেন, ফাঁসি বরণ করলেন, ক্ষুদিরাম, বাঘা যতীন, প্রফুল্ল চাকী, আসফাকুল্লাহ প্রভৃতি জেলে গেলেন, ফাঁসির দড়িতে প্রাণ দিলেন, তাঁদের জেলে যাওয়া বা মৃত্যুবরণ করার রাস্তাটা দেশবাসী সঠিক বলবে না বেঠিক? এক কণ্ঠে সবাই বলবেন সঠিক। কিন্তু স্বামীজীর মত মানুষ রাজনীতি হতে শুধু সরেই দাঁড়ালেন না, ঘোষণাও করলেন 'no connection with politics'। স্বামীজীর মত আন্তর্জাতিক মানুষের মুখ থেকে ঠিক সেই সময়ে এরকম কথা বের হওয়া মানে অজস্র শিক্ষিত ছেলেকে রাজনীতি হতে হাত গুটিয়ে নিতে উদ্বুদ্ধ করা—একথা বললে কি ভুল হবে?

কোন নেতা যদি এই উক্তি করেন তাহলে তার অর্থ কী হতে পারে? —"আগামী পঞ্চশৎ বর্ষ ধরিয়া সেই পরম জননী মাতৃভূমি যেন তোমাদের আরাধ্যা দেবী হন। অন্যান্য অকেজো দেবতাগণকে এই কয়েক বর্ষ ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত।" যদি আমার মত কোন লেখক লিখতেন তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারতো, কালী, দুর্গা, শিব সব তাহলে অকেজো? আর পঞ্চাশ বছর পূজো পার্বণ আমরা বন্ধ করবো? কিন্তু উপরের উদ্ধৃতিটি 'ইতিহাসের ইতিহাসে' থাকলেও ওটা ছিল স্বামীজীর কথা — সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা 'বাঙ্গালীর রাষ্ট্রচিন্তা' পুস্তকের ২৩৯ পৃষ্ঠা এবং 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১৯৮-১৯৯ দ্রষ্টব্য।

এখন যদি এই বিতর্কিত 'পঞ্চশৎ বর্ষ', যার অর্থ পঞ্চাশ বছর নিয়ে কেউ বলেন তিনি ১৮৬৩ সালে ভূমিষ্ঠ হন এবং ১৯০২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়, মাত্র ৩৯ বছর তিনি বেঁচে ছিলেন—তিনি যখন একথা বলেছিলেন তখন তিনি নিশ্চয় জানতেন আর পঞ্চাশ বছর বাঁচার সম্ভাবনা তাঁর ছিল না। সুতরাং তাঁর জীবদ্দশায় ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে তিনি এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলেন বললে আমার বা আমাদের অনেকের মতে ঠিক না হলেও, কিছু বিচক্ষণ মানুষের চিন্তার স্রোতকে থামানো যাবে কি?

এবার ইংরেজের ওষুধ খাওয়া বঙ্কিম এবং দেশবাসীকে ভেড়ায় পরিণত করার কথা নিয়ে আলোচনা করা যাক।

আমাদের রোগ হলে ওষুধ খাই এবং সুস্থ হই। ইংরেজের চোখে আমাদের বিপ্লব-আন্দোলন, হত্যা-লুঠ, অগ্নিসংযোগ অসহযোগ প্রভৃতি ছিল অন্যায় এবং অস্বাভাবিক। তাই আমাদের স্বাভাবিক করবার জন্য তাঁরা ওষুধ ব্যবহার করলেন—কোন জায়গায়

তোষণ ও পোষণ আবার কোন স্থানে শাসন ও শোষণ। অর্থাৎ নানা রকমের ওষুধ ছিল—প্রলোভন, ভয়-প্রদর্শন, পদোন্নতি, প্রশংসা, পুরস্কার বিতরণ, পদক প্রদান, উপাধি প্রদান, প্রহার, গুলি প্রভৃতি।

বঙ্কিমচন্দ্র সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারি ছিলেন এটা দোষনীয় নাও হতে পারে, কারণ স্বাধীনতার ইতিহাসে বহু মানুষ সরকারের অধীনে থেকে দেশবাসীর আন্দোলনে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন, আবার কেউ কেউ পরোক্ষ সমর্থন করেছেন দেশবাসীকে, কিন্তু ইংরেজের বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে ইচ্ছা করেন নি। আর কিছু মানুষ এমন আছেন যাঁরা ইংরেজকে রক্ষা করতে দেশবাসীকে স্বাধীনতা আন্দোলন হতে বিরত রাখতে চেষ্টা করছেন—তাঁরা মারাত্মক অপরাধ করেছেন। বঙ্কিমকে কেউ যদি সেই দোষে দোষী করেন তাহলে তাঁরও অপরাধ হবে, যদি প্রমাণের অভাব থাকে। আর যদি প্রমাণের অভাব নাও থাকে তাহলে আমি দোষী হতে পারি। অবশ্য কোন অমুসলমান লেখকের লেখা হতে প্রমাণ পেশ করলে অপরাধ হবে না—অন্ততঃ বর্তমান ভারতে।

বিশাল ভারতে কোটি কোটি মানুষ হিন্দুধর্মকে অবলম্বন করে শান্তি পেয়েছেন বা পাচ্ছেন। এই ধর্মকে যদি আমি 'নিষ্কাম' বলি তাহলে হৈ হৈ হয়ে যাবে, ধারণা হবে হয়তো আমি মুসলমান অথবা আরও কিছু। নিষ্কাম শব্দের অর্থ ফল-আশা শূন্য [দ্রষ্টব্য অভিধান 'চলন্তিকা', পৃষ্ঠা ৩৮৬]। এবার একটি উদ্ধৃতি লক্ষ্য করুন, "যেদিন ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প এবং ভারতবর্ষের এই নিষ্কাম ধর্ম একত্রিত হইবে সেইদিন মনুষ্য দেবতা হইবে।"—এ কথাটি কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের। [দ্রষ্টব্য 'বঙ্কিম রচনাবলী' সংসদ সংস্করণ, খণ্ড ২, পৃ. ৬৩৩ (ধর্মতত্ত্ব)]

তিনি ইংরেজের আদেশে হোক অথবা ভয়ে হোক, রাজনীতির সংস্রবমুক্ত ছিলেন। তার অনেক প্রমাণের মধ্যে একটি হচ্ছে—তাঁর ভাই শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে তিনি চিঠিতে লিখেছিলেন, "I won't take up politics, because then I would be sure to rouse the indignation of Anglo Saxonian against 'Mookerjee'. That is why 'Bangadarshan' has little of politics in it." [দ্রষ্টব্য 'Bengal Past and Present' Vol.8, Part II, No. 16, April-June 1914, p. 279]

বঙ্কিম সম্পর্কে কিছু বললে যদি তা প্রচলিত ইতিহাসের বাইরে হয় তাহলে বিশেষ করে কংগ্রেস কর্মী বা ভক্তগণ অত্যন্ত চটে উঠবেন। এই পরিস্থিতিই চলুক তাতে আপত্তি করে লাভ কতটুকু? তাই বলে কি সত্য তথ্য পৃথিবী থেকে নষ্ট করে দিতে হবে?

একবার একজন বলেছিলেন, "কংগ্রেসের প্রতি আমার সহানুভূতি নাই, একথা আমি কখনই বলিতে পারি না—উহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ, তদ্বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু যে প্রণালীতে উহার কার্য্য পরিচালিত হইতেছে আজ পর্যন্ত উহা

সাধারণের যোগদানের উপযুক্ত হয় নাই। উহার সমস্ত আন্দোলন যেন ক্ষণস্থায়ী ও অন্তঃসারশূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উহা এখনও সমস্ত দেশের সাধারণ সম্পত্তি হয় নাই। দেশের সাধারণ লোকদিগকে দূরে অন্ধকারে রাখিয়া কতিপয় শিক্ষিত লোকের অভিপ্রায় অনুরূপ কার্য্য সাধিত হইলে কখনই উহার গৌরব বর্দ্ধিত হইবে না।" লেখাটি পড়লে মনে হবে কোন কমিউনিষ্ট বা কোন কংগ্রেসের শত্রুর লেখা। লেখাটা কিন্তু শ্রী বঙ্কিমচন্দ্রের। [প্রমাণ ঃ বঙ্কিম রচনাবলী, সংসদ সংস্করণ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৪, যোগেশচন্দ্র বাগল লিখিত ভূমিকায় লিপিবদ্ধ]

এখন বঙ্কিমের খাতিরে যদি এই অর্থ করা হয় যে, তিনি কংগ্রেসকে আরও ব্যাপক করতে চেয়েছিলেন এবং স্বভাবতই আন্দোলন, হত্যা, অসহযোগ আরও বৃদ্ধি হওয়ার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন, তাহলে তাঁর কর্মে ও লেখায় তার প্রমাণ খোঁজা দরকার।

যখন বিপ্লবের আগুন চারিদিকে ধূ ধূ করে জ্বলছিল, সেই সময় যদি আমার মত কোন মানুষ ইংরেজ শাসিত সমাজের জন্য বলতো—"সমাজকে ভক্তি করিবে, ইহা স্মরণ রাখিবে যে, মনুষ্যের যত গুণ আছে সবই সমাজে আছে। সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দণ্ডপ্রণেতা, ভরণপোষণ ও রক্ষাকর্ত্তা, সমাজই রাজা, সমাজই শিক্ষক, ভক্তিভাবে সমাজের উপকারে যত্নবান হইবে।" তাহলে রাজা ও সমাজ এক, ইংরেজ রাজের শোষণ যাঁড়াশী সমাজে যা চলছে তা মুখ বুজে মেনে নাও, বিপ্লবে যেও না—এই অর্থ হয় না কি? লেখাটি কিন্তু আমার নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের [দ্রষ্টব্য বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬১৯]। তাঁর উপর আমরা যাঁরা অন্ধভক্তি রাখি হয়তো বলতে পারি, স্পষ্ট করে তো বলেননি ইংরেজ রাজাকে বাবার মত ভক্তি কর নইলে সমাজ ধ্বংস হবে, বরং তিনি সমাজের প্রশংসা করেছেন; ইংরেজ রাজার বিরুদ্ধমতেও তো একটা সমাজ সৃষ্টি করা যায়। কিছু বোকা বা সাদাসিধে লোককে এই বলে বোঝানো যেতেও পারে। কিন্তু লক্ষ্য করুন—"গৃহের কর্তার ন্যায় পিতামাতার ন্যায় রাজা সেই সমাজের শিরোভাগ। তাঁহার গুণে তাঁহার দণ্ডে তাঁহার পালনে সমাজ রক্ষিত হইয়া থাকে। পিতা যেমন সন্তানের ভক্তির পাত্র, রাজাও সেইরূপ প্রজার ভক্তির পাত্র, প্রজার ভক্তিতেই রাজা শক্তিমান—নইলে রাজার নিজ বাহুতে বল কত? রাজা বলশূণ্য হইলে সমাজ থাকিবে না।" এরকম কথা কে বলতে পারে? প্রশ্ন করলে সহজেই স্কুলের বালকেরাও উত্তর দেবে—ইংরেজের দালাল ও দেশের শত্রুরা। হয়তো তাদের এই উত্তর বর্তমান সমাজে অন্যায় হবে অথবা তাদের স্বীকার করতে হবে, তাই বলে প্রকৃত বিচারকের কাঠগড়ায় এর সঠিক রায় বের হবে না কি? এখন পাঠক পাঠিকাদের জানাই উপরের কথাটি কোন অনুবাদ নয়, তখনকার বৃটিশরাজের স্বপক্ষে বঙ্কিমের নিজের মন্তব্য। [প্রমাণ ঃ বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬১৬]

আমি যে 'ভেড়া' শব্দ ব্যবহার করেছি, তা তো বঙ্কিম বা স্বামীজীকে বলিনি, বলেছি সমাজকে; তার মধ্যে আমিও তো একজন। শিক্ষক মাত্রেই জানেন ছাত্রদের

পড়া না হলে বাঁদর, ভেড়া, গাধা বলে বকুনি দেওয়া হয়। এগুলোর অর্থ নির্বোধ। যদি বঙ্কিমের ঐ কথাগুলো সমাজের লোক মেনে নিতেন তাহলে আজও স্বাধীনতা আসত না। তাই বঙ্কিমের ঐ কথা সমাজ গ্রহণ করেনি। যদি করতো তাহলে ভেড়ার মতই মেষ পালকের অধীনে থাকতে হোত।

এবারে যদি কেউ ইতিহাসে লেখেন, ইংরেজের ওষুধ খাওয়া বঙ্কিম দেশ ও সরকারকে দেবতার মত ভক্তি করবার জন্য সমাজকে ভেড়ার মত বোকা বানাতে চেয়েছিলেন, তাহলে তা কি ভুল হবে? আর স্বামীজী বলেছেন, সব অকেজো দেবতা, শুধু কাজের দেবতা মাতৃভূমি। শুধু তাই নয়, স্বামীজী আরও বলেছেন, "রাজা প্রজাদিগের পিতামাতা, প্রজারা তাঁহার শিশু সন্তান, প্রজাদের সর্বোতভাবে রাজমুখাপেক্ষী হইয়া থাকা উচিত" [দ্রষ্টব্য 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা', খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ২৩৬]। অন্যদিকে বঙ্কিম বলেছেন, মাতৃভূমির পিতা হচ্ছেন ইংরেজ রাজা। অতএব দুজনের কথা হুবহু না হলেও গন্ধ এক। একথা বর্তমান ভারতের ইতিহাসে যদি লেখা নাই যায়, তাই বলে 'ইতিহাসের ইতিহাসে' লেখা যাবে না কেন?

'ল্যাককানাইনাম' একটি ওষুধের নাম। ওটা স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার হয়। হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান পবিত্রভাবে পবিত্র স্থানে সকলেই তা সেবন করতে পারেন। ওষুধটি কিন্তু কুকুরের দুধ হতে তৈরি। এই সত্য কথাটা যদিও শিশির গায়ে লেখা উচিত নয়, লোকে ভুল বুঝবে, তাই বলে কোন বইয়ের কোন জায়গাতেই কি লেখা থাকবে না? যারা আগামীতে জানতে চাইবে, গবেষণা করবে, তাদের জন্য এ সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া হবে? তাই আমি এখনো আশা রাখি, 'ইতিহাসের ইতিহাস' নেহাত ইতিহাস নয়, ইতিহাসের উৎস; সুতরাং ইতিহাসের উৎস সন্ধানীদের স্বাধীনতা বা অধিকারে সরকারি হস্তক্ষেপ করতে হলে বা হস্তক্ষেপ হয়ে থাকলে তা দলীয় বা ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতার উর্ধে থেকে খুব ভেবেচিন্তে দেখা দরকার। আপনি বঙ্কিমকে শ্রদ্ধা করুন, তাঁর ছবি নিয়ে পূজো করুন, তাঁকে স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল গুরু মনে করুন, তাঁর কোন বই সরকার বাজেয়াপ্ত না করলেও লিখুন তাঁর সব বই বাজেয়াপ্ত হয়েছিল, তাঁর 'বন্দেমাতরম' বাজেয়াপ্ত না হলেও বলুন বাজেয়াপ্ত হয়েছিল, তাতে আমরা হৈ হৈ করছি না। কিন্তু তাঁর নিজের হাতের লেখা তথ্যগুলো ভবিষ্যতে যাতে কেউ জানতে না পারে তার ব্যবস্থা করার অর্থ হচ্ছে তো এই সমস্ত বই বন্দী করা! যদি তাই উদ্দেশ্য থাকে তাহলে ভারতের যত লাইব্রেরি আছে তা অগ্নিদগ্ধ করা ছাড়া আর উপায় কী?

স্বাধীনতার বিরুদ্ধে তিনি নিজে স্পষ্টমত প্রকাশ করে বলেছেন,—"স্বাধীনতা দেশী কথা নহে, বিলাতি আমদানি, 'লিবার্টি' শব্দের অনুবাদ.....ইহার এমন তাৎপর্য্য নয় যে রাজা স্বদেশী হইতে হইবে।"

একই মুখে বঙ্কিমের প্রশংসা আর বন্দেমাতরম, আর সেই মুখেই ইতিহাস পড়ছি, শিখছি, শেখাচ্ছি—পরাধীন ভারত অনেক রক্ত ও জীবনের মূল্যে স্বাধীন হয়েছে — কী দরকার ছিল স্বাধীনতা আনার? সবাই জানি বা জানেন, ইংরেজ সরকার শাসনের

নামে শোষণ করতো। তাই বারে বারে দেশে দেখা গেছে দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর। আর দিনে দিনে ইংল্যাণ্ড হয়েছে সমৃদ্ধিশালী। কিন্তু বঙ্কিমের ইংরেজের পক্ষে ওকালতি অথবা দালালি ইতিহাসের ক্লাসে কেউ কল্পনা করতে পারেন না। কিন্তু এই উক্তি কি বঙ্কিমের নয়?—"এই সকল তত্ত্ব বুঝিতে যাঁহারা যত্ন করিবেন, তাঁহারা দেখিবেন যে, কি আমদানিতে, কি রপ্তানিতে, বিদেশীয় বণিকেরা আমাদের টাকা লইয়া যাইতেছেন না, এবং তন্নিবন্ধন আমাদের দেশের টাকা কমিতেছে না। বরং বিদেশীয় বাণিজ্যকারণ আমাদিগের দেশের ধন বৃদ্ধি হইতেছে। যাঁহারা মোটামুটি ভিন্ন বুঝিবেন না, তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখিবেন, বিদেশ হইতে কত অর্থ আসিয়া এখানে ব্যয় হইতেছে। বাংলাদেশ নির্ধন বটে কিন্তু পূর্বাপেক্ষা বাংলা যে এক্ষণে নির্ধন এরূপ বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। বর্তমানকাল অপেক্ষা ইতিপূর্বকালে যে বাঙ্গালা দেশে অধিক ধন ছিল তাহার কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। বরং এক্ষণে যে পূর্বাপেক্ষা দেশের ধন বৃদ্ধি হইতেছে তাহার অনেক প্রমাণ আছে।" [দ্রষ্টব্য : বঙ্কিম রচনাবলী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩১৩]

'বন্দেমাতরম' স্রষ্টা শ্রীবঙ্কিমের নিজের হাতে বাংলায় লেখার আরও নমুনা—"ইংরেজ ভারতবর্ষের পরম উপকারী। ইংরেজ আমাদিগকে নতুন কথা শিখাইতেছে, যাহা আমরা কখন জানিতাম না তাহা জানাইতেছে; যাহা কখন দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই তাহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে, বুঝাইতেছে যে পথে কখনো চলি নাই, সেই পথে কেমন করিয়া চলিতে হয় তাহা দেখাইয়া দিতেছে। সেই সকল শিক্ষার মধ্যে অনেক শিক্ষা অমূল্য। যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরেজদের চিত্তভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে দুইটির আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম— স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা ও জাতিপ্রতিষ্ঠা। ইহা কাহাকে বলে তাহা হিন্দু জানিত না" [বঙ্কিম রচনাবলী, পৃষ্ঠা ২৪০-৪১]। যদি এটা আমার লেখা হোত তাহলে হয়ত আমার পরিত্রাণ থাকত না। মনে রাখা ভাল, এগুলো জানবার উপায় কিন্তু শুধুমাত্র সরকারি পাঠ্যপুস্তক নয়। বরং বেসরকারি পুস্তক নির্ভর করেই তার বেশিরভাগই জানতে হবে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার গর্বে যাঁরা গর্বিত তাঁরা 'সিপাহি বিদ্রোহের' জন্যও গর্বিত। তাতে যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাঁদের মর্যাদা দিতে কেউ কুণ্ঠিত নন্। কিন্তু যে সময়ে হয়েছিল ঐ বিদ্রোহ সেটা তো বঙ্কিমেরই যুগ। তিনি কি তাতে যোগ দিয়েছিলেন, অথবা সমর্থন করেছিলেন? তদুত্তরে 'বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা' গ্রন্থের ১১৪ পৃষ্ঠার একটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি : "বাংলার সমকালীন বুদ্ধিজীবীদের মত তিনিও [বঙ্কিম] সিপাহী বিদ্রোহকে সমর্থন করেন নি। আবার দীনবন্ধু মিত্রের একান্ত বান্ধব বঙ্কিমচন্দ্র নীলকরদের অত্যাচার প্রত্যক্ষ করেও সে বিষয়ে নীরব থাকেন।" লেখক যদি আমি হতাম তাহলে হয়ত অবস্থা চরমে পৌঁছাতো, কিন্তু এর লেখক সৌরেন্দ্রবাবু।

ইংরেজেরা যখন জমিদারদের দ্বারা 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে'র প্রবর্তন করলেন এবং ইংরেজের বিরুদ্ধে দেশের জনসাধারণ যখন অত্যাচারের চাপে বিদ্রোহী হয়ে উঠলো

সই সময় বঙ্কিম দেশবাসীর জন্য একটু কপট সমবেদনা জানালেও আমরা অনেকে সেটাও ফলাও করে বাড়িয়ে চড়িয়ে বলতাম। তিনি কিন্তু বলেছিলেন, "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধ্বংসে বঙ্গ সমাজে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা হইবার সম্ভাবনা। আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি। বিশেষ যে বন্দোবস্ত ইংরাজরা সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া চিরস্থায়ী করিয়াছেন, তাহারা ধ্বংস করিয়া তাঁহারা এই ভারতমণ্ডলে মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত হয়েন, প্রজাবর্গের চিরকালের অবিশ্বাসভাজন হয়েন, এমত কুপরামর্শ আমরা ইংরাজদিগকে দিই না। যেদিন ইংরাজের অমঙ্গলাকাঙ্খী হইব, সেইদিন সে পরামর্শ দিব।" [বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৯-৩১০]

ইংরেজের শোষণের বিরুদ্ধে যখন নবীন ও প্রবীণ সবাই বিরক্ত এবং উত্তপ্ত তখন বঙ্কিম নিজের ভাষায় লিখলেন, "যদি কাহারও ক্ষতি না করিয়া [ইংরাজরা] মুনাফা করিয়া থাকে তবে তাহাতে আমাদের অনিষ্ট কি? যেখানে কাহারও ক্ষতি নাই সেখানে দেশের অনিষ্ট কি? আপত্তির মীমাংসা এখনো হয় নাই। আপত্তিকারকেরা বলিবেন যে, ঐ ছয়টি টাকায় দেশী তাঁতীর কাছে থান কিনিলে টাকা ছয়টা দেশেই থাকিত। ....স্থূলকথা, ঐ ছয় টাকা যে দেশী তাঁতী পাইল না, তাহাতে কাহারও ক্ষতি নাই। ....তার্কিক বলিবেন, তাঁতীর ক্ষতি আছে। এই থানের আমদানীর জন্য তাঁতীর ব্যবসায় মারা গেল। তাঁতী থান বুনে না ধুতি বুনে। ধুতি অপেক্ষা থান সস্তা সুতরাং লোকে থান পরে, ধুতি আর পরে না। এজন্য অনেক তাঁতীর ব্যবসায় লোপ হইয়াছে। [বঙ্কিমের] উত্তর—তাহার তাঁত বোনা ব্যবসায় লোপ হইয়াছে বটে, কিন্তু সে অন্য ব্যবসা করুক না কেন? অন্য ব্যবসায়ের পথ রহিত হয় নাই। তাঁত বুনিয়া আর খাইতে পায় না, কিন্তু ধান বুনিয়া খাইবার তো কোন বাধা নাই।" [প্রমাণ ঃ বঙ্কিম রচনাবলীর ২য় খণ্ডের ৩১১ ও ৩১২ পৃষ্ঠা]

পাঠক পাঠিকাদের একাধিকবার তাঁর নিজের রচনাগুলো পড়বার জন্য অনুরোধ করি। এত কাণ্ড করেও যদি প্রচলিত ইতিহাস এই শিক্ষাই দেয় যে, তিনিই ছিলেন ভারতের স্বাধীনতার মূল গুরু, তাহলে মেনে নিতে হবে ইংরেজরা শোষণ করেননি শাসন করেছেন, আর নিজেদের দেশে কিছুই নিয়ে যাননি আমাদের ভারতেই তাঁরা সব রেখে গেছেন, ভারতেই তাঁরা মোঘলদের মত টাকা খরচ করেছেন এবং মৃত্যুবরণ করে ভারতের মাটিতে মিশে গেছেন। কারো যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আমার মত লেখকেরই বা আপত্তি কিসের? তবে শুধু এটুকুই দাবি—তথ্যগুলো হজম করে দেওয়ার জন্য গ্রন্থাগার হতে বই সরিয়ে দেওয়া, আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া অথবা কোন লেখকের উদ্ধৃতি সম্বলিত গ্রন্থকে বাজেয়াপ্ত করা মহা অত্যাচার কিনা চিন্তা করতে বাধা কোথায়?

ইতিহাসের সেরা ছাত্ররা জানেন যে এই ভারতে ১৮০০ সালে চালের দর ছিল টাকায় ১মণ ৫ সের [১ সের = ১ কিলো অপেক্ষা সামান্য কম]। তার ১৩ বছর পর ১৮১৪ সালে চালের দর হল টকায় মাত্র ৩৭ সের। তার সাত বছর পর চালের দর হোল টাকায় ৩০ সের।

ইংরেজের শোষণের ফলে ১৮৭৫ সালে চালের দর হোল টাকায় মাত্র ১৭ সের। ১৯২৫ সালে ইংরেজের করুণায় চালের মূল্য দাঁড়ালো টাকায় মাত্র ৪ সের।

১৮১৩ সাল পর্যন্ত দেশী তাঁতীর সর্বনাশ করার জন্য খুব বেশি কাপড় বিলেত হতে আনা হয়নি। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় বিলাতি কাপড় এল ৮ লাখ গজ। ১৮২১ সালে কাপড় এল ২ কোটি গজ। ১৮৩৫ সালে এল ৩৫ কোটি গজ। ১৮৭৫ সালে আবার কাপড় এল ৬১ কোটি গজ। ১৯২৫ সালে কাপড় এল একেবারে ১৫৬ কোটি গজ। [মায়ীশাতুল হিন্দ্, পৃষ্ঠা ৯৫]

কাপড়ের হিসাব ছাড়াও ১৯১৩ সালে ৬ কোটি ৭৫ লক্ষ মণ চাল ভারত হতে ইংলণ্ডে পাচার হয়ে চলে যায় এবং ৩ কোটি ৫০ লক্ষ মণ গম বিলেতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেইসঙ্গে দেড় কোটি মণ তুলো বিলেতে পাচার করা হয়। আর মনিবের দেশে পাট পাচার হয় আড়াই কোটি মণ। সেই সঙ্গে ভারতের সেরা চা পাঠানো হয় ৩৬ লক্ষ মণ। [প্রমাণ ঃ উপরোক্ত পুস্তক]

তাছাড়া ভারত হতে ১৯১৮ হতে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে আবার আরও ৫৬ কোটি ৫০ লক্ষ মণ চাল বিলেতে পাচার হয়ে যায়। [শ্রীদয়াশঙ্কর দোবের 'মজলুম কিষাণ' পৃ. ৮২ দ্রষ্টব্য]

ভারতের ইংরেজ শাসনকালে জজ্ বা বিচারকের পদে শুধু ইংরেজরাই ছিলেন তা নয় বরং ভারতীয় কিছু বিচারপতিও ঐ পদ পেয়েছিলেন। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কথা হচ্ছে কোন ইংরেজ আসামীর বিচার করার অধিকার ভারতীয় বিচারকদের ছিল না। তার জন্য ভারতের প্রগতিবাদীরা প্রতিবাদ করতে এবং আন্দোলন করতে ইচ্ছা করেন। আর ঠিক সেই সময় বঙ্কিম বলেছিলেন, "ভারতীয়রা ইংরেজদের বিচার করতে পারে না। কিন্তু শূদ্রেরা কি ব্রাহ্মণের বিচার করতে পারতো?" [বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা, পৃ. ১৩৬ দ্রষ্টব্য]

পাশ করার উদ্দেশ্যে যাঁদের পড়া, তাঁদের জন্য শুধু 'ইতিহাস' দরকার। আর যাঁরা ঐতিহাসিক হতে চান, গবেষণা করতে চান, চিন্তার খোরাক দিতে ও নিতে চান, তাঁদের জন্য এরকম আলোচনা তো অপরিহার্য। আমি আশা করি সরকার পুনর্বিবেচনা অথবা পুনর্বিচার করলে 'ইতিহাসের ইতিহাস' বন্দী থাকবে না, মুক্তি পাবে—অদূর অথবা সুদূর ভবিষ্যতেও। বলাবাহুল্য, কেন আমি 'ইংরেজের ওষুধ খাওয়া' বলেছিলাম, তার কৈফিয়েৎ দিলাম।

রবীন্দ্রনাথের জন্য আমি নাকি 'ইতিহাসের ইতিহাসে' লিখেছি ঃ "রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন নিজের কবি প্রতিভায় নয়, ইংরেজদের তোয়াজ করেই পেয়েছেন।"

আমার বইয়ের ৭০৫ পৃষ্ঠা হতে ৭২৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের আলোচনা আছে। এই ৭০৫ হতে ৭২৩ পৃষ্ঠার মধ্যে বাক্য দুটি ঐ ভাবে লেখা নেই।

সেখানেও বিকৃত করা হয়েছে, যেমন স্বামীজীর ক্ষেত্রে বিকৃত করা হয়েছিল—"তিনি আমেরিকা গিয়েছিলেন অর্থ ও বিশ্বসুন্দরী মার্গারেটের জন্য" ইত্যাদি। এটা 'বসিরহাট হিতৈষী' নামক পত্রিকাটিতে ছাপা হয়েছে। বসিরহাট থেকেই মুদ্রিত। এই অশ্লীল কথাটি যেভাবে লেখা হয়েছে তা আমার ঐ বইয়ে নেই। কিভাবে আছে এবং কেন আছে তার আলোচনা করা হয়েছে। এখন 'রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন নিজের কবি প্রতিভায় নয়, শুধুমাত্র ইংরেজদের তোয়াজ করেই পেয়েছেন'—একথা আমার বইয়ে রবীন্দ্র প্রসঙ্গে লেখা আছে কিনা, যাঁরা বই পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন, এ তথ্য সঠিক নয়। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রথমেই কি লেখা নেই যে, 'আমাদের দেশের নেতারা যাঁদের নেতা বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম ছিলেন'। আমার ঐ বই-এ লেখা আছে, তিনি ডিগ্রিধারী শিক্ষিত না হলেও প্রকৃত যোগ্যতাযুক্ত সুপ্তসনদে বিজড়িত ছিল তাঁর প্রতিভা। বঙ্কিমের যেমন 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি ভারতে প্রতিধ্বনিত, তেমনি রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটিও সারা ভারতের জাতীয় সঙ্গীত। অতএব ভারতের স্বাধীনতায় অবশ্যই যে তাঁর অবদান থাকবে তা আশা করা খুবই স্বাভাবিক—একথা কি লেখা নেই 'ইতিহাসের ইতিহাসে'?

বইয়ের প্রথমেই লেখা আছে 'ইতিহাসের ইতিহাস—গবেষণামূলক, উদ্ধৃতি ও তথ্যবহুল গ্রন্থ'; সুতরাং তাতে শুধু রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাই থাকবে তা নয়, তাঁর অন্ধকার দিক বা দুর্বলতার দিকটাও যে তুলে ধরা হবে না তাও নয়। প্রাসঙ্গিকভাবেই 'বাজেয়াপ্ত ইতিহাসে' শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'র কথা তুলে ধরছি। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পূর্বে ঐ বন্দী বই মুক্তি পায় নি। পরে অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর পরে তা মুক্তি পেয়েছে। ঐ সময় তিনি রবীন্দ্রনাথকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন যাতে ইংরেজরা তাঁর বইয়ের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। এ সম্বন্ধে আলোচনার ইঙ্গিত পূর্বে দিয়েছি; এখন আলোচনা করছি।

আচ্ছা শরৎচন্দ্র কবিগুরুকে পত্র দেবেন কেন? তিনি তো পত্র দিতে পারতেন কোন ইংরেজ প্রভু বা বড়লাটকে? তাহলে শরৎচন্দ্রেরও ধারণা ছিল, ইংরেজকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের উপর সন্তুষ্ট রেখেছেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ রাজি হলেই ইংরেজও রাজি হতে পারে। ভুলে যাবার কথা নয় যে, রবীন্দ্রনাথের সময়ে দেশে স্বাধীনতা আন্দোলন ও স্বরাজ আন্দোলনের ঢেউ-এ কত দেশী মানুষের ফাঁসি হচ্ছিল, জেল হচ্ছিল, চাবুক খেতে হচ্ছিল, মা বোনদের ইজ্জত হারাতে হচ্ছিল। আবার অপরদিকে ভারতীয়রা ইংরেজদের খতম করছিলেন, বোমা মারছিলেন, ব্যাঙ্ক অস্ত্রাগার লুঠ করছিলেন, ইংরেজদের ধনী দালালদের বাড়িতে বিপ্লবীরা হানা দিয়ে টাকা পয়সা সংগ্রহ করছিলেন। তখন যাঁরা মরেছেন, মেরেছেন বা ঐসব কাজ করেছেন তাঁরা আজ ইতিহাসের পাতায় অমর। যাঁরা নিরপেক্ষ ছিলেন ইতিহাসে তাঁরা আজ অপাংক্তেয়। আর যাঁরা বিরোধিতা করেছেন তাঁদেরকে আজকের ছেলেরা বিশ্বাসঘাতক, দালাল ইত্যাদি অনেক কিছু বলে দেবে। অবশ্য সবক্ষেত্রে বলা মুশকিল আছে, অনেক বাধা আছে।

সমাজ বিরোধীরা অন্যায়, খুন জখম করে যেমন অপরাধী হয়, রাজনৈতিক নেতাদের স্বাধীনতার নামে হত্যা লুঠপাটকেও রবীন্দ্রনাথ ঐ রকম সমান অপরাধ মনে করতেন [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'দণ্ডনীতি', 'প্রবাসী', আশ্বিন ১৩৪৪]। শ্রী সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ও রবীন্দ্রনাথের জন্য লিখেছেন, আন্দোলন করতে, খুনজখম, লুঠপাটের জন্য যারা দায়ী তারাও অন্যান্য অপরাধীদের চেয়ে কম ঘৃণ্য নয় বলে তিনি মনে করতেন। [বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা, ৩৪৮ পৃষ্ঠা]

১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগে ভারতীয়দের নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়। সেই সময় কবিগুরু তাঁর ইংরেজের দেওয়া নাইটহুড প্রত্যাখ্যান করেন বলেই আমরা জানি। কিন্তু ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মুজাফ্‌ফর আহমদ তাঁর লেখা 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি'তে [প্রথম মুদ্রণ] তীব্রভাবে তার প্রতিবাদ ও খণ্ডন করেছেন। তাঁর দাবী 'অযৌক্তিক' বলা মুশকিল। তাঁর বক্তব্য হোল, 'স্যার' টাইটেল তিনি ত্যাগ করতে পারেন নি; তারপরেও তাঁর নামে 'স্যার' লেখা হোত।

১৯২২ সালে কবিগুরুর "শান্তিনিকেতনের অদূরে শ্রীনিকেতনে (Rural Reconstruction) বা পল্লী সংগঠন প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। তার প্রথম পরিচালক ছিলেন লেনার্ড কে. এল্মহার্স্ট। ব্যয় নির্বাহের জন্য [ইংরেজদের মাধ্যমে] আমেরিকা হতে অর্থ সংগৃহীত হয়।" [বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা, পৃষ্ঠা ৩২৭]

গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথকে পাশাপাশি এক করা যায় কি করে? "রবীন্দ্রনাথ গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে নীতিগতভাবে সায় দিতে পারেন নি...চরকাতত্ত্ব ও অহিংস রাজনীতির ফাঁকাবুলি তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি" [পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩২৯]। রবীন্দ্রনাথ স্বাধীনতা বা ফ্রিডমকে ভাল চোখে দেখেন নি—'পশ্চিমী রাষ্ট্রদর্শনে যাকে ফ্রিডম বলা হয়' রবীন্দ্রনাথ তাকে 'চঞ্চল, ভীরু স্পর্দ্ধিত ও নিষ্ঠুর' আখ্যা দিয়েছেন। [রবীন্দ্র রচনাবলী, 'ভারতবর্ষ ও স্বদেশ', খণ্ড ১২, পৃষ্ঠা ১০২৫]

গান্ধীজীর চরকা তত্ত্বের তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে : "স্বরাজ নিজেই নিজেকে অগ্রসর করতে থাকবে। চরকার যান্ত্রিক প্রদক্ষিণ পথে নয়, প্রাণের আত্মপ্রবৃত্ত সমগ্র বুদ্ধির পথে" [দ্রষ্টব্য রবীন্দ্র রচনাবলী 'স্বরাজ সাধন', খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা ৩৪৩]। গান্ধীর রাজনৈতিক পদ্ধতি তিনি মোটেই গ্রহণ করেননি। তাঁর মতে, 'বিদেশী বস্ত্র পোড়ানোয় জাতি বিদ্বেষই প্রকাশ পায়'; তাই সেই নীতিকে তিনি সমর্থন করেন নি। [দ্রঃ রবীন্দ্র রচনাবলী, 'কালান্তর' খণ্ড ১৩, পৃ. ৩০৩]

আমাদের আলোচনার সূত্র ছিল—কেন কবিগুরুকে শরৎবাবু তাঁর বই মুক্ত করবার জন্য ইংরেজকে অনুরোধ করতে বললেন? যদি কেউ বলেন, সারা পৃথিবীর প্রায় সব দেশে ইংরেজকে খুশী করতে তাঁর পরিশ্রমশীলতা ও দক্ষতা অস্বীকার করা যায় না এবং ইংরেজ প্রীতি অথবা ভীতি তাঁর মধ্যে কিছু একটা ছিল, যার জন্য শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' বইটি মুক্ত করবার জন্য তাঁর ভূমিকা ঐতিহাসিক গবেষণার

বিষয়—তাহলে তাঁর এই উক্তিকে কম গুরুত্ব দেওয়া যাবে না। শরৎবাবু একেবারে রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে বাজেয়াপ্ত হওয়া 'পথের দাবী' বইটি উপহার দেন এবং তাঁর মতামত চেয়ে পত্র দিতে অনুনয় করেন। বইটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ যে চিঠি দেন সেটা 'দরদী শরৎচন্দ্র' গ্রন্থ হতে সংগৃহীত। লেখক মনীন্দ্র চক্রবর্তী। চিঠিটি তুলে ধরছি ঃ

"কল্যাণীয়েষু,

তোমার 'পথের দাবী' পড়া শেষ করেছি। বইখানি উত্তেজক। অর্থাৎ ইংরেজের শাসনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে। লেখকের কর্ত্তব্যের হিসাবে সেটা দোষের না হতে পারে—কারণ লেখক যদি ইংরাজ রাজকে...মনে করেন তাহলে চুপ করে থাকতে পারেন না। কিন্তু চুপ করে না থাকার যে বিপদ আছে, সেটা স্বীকার করাই চাই। ইংরেজ রাজ ক্ষমা করেন এই জোরের উপরেই ইংরেজ রাজকে আমরা নিন্দা করব সেটাতে পৌরুষ নেই। আমি নানা দেশ ঘুরে এলাম—আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এই দেখলাম—একমাত্র ইংরেজ গভর্ণমেন্ট ছাড়া স্বদেশী বা বিদেশী প্রচার বাক্যে বা ব্যবহারে বিরুদ্ধতা আর কোন গভর্ণমেন্ট এতটা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে না। নিজের জোরে নয়, পরন্তু সেই পরের সহায়তার জোরেই যদি আমরা বিদেশী রাজত্ব সম্বন্ধে যথেচ্ছ আচরণের সাহস দেখাতে চাই, তবে সেটা পৌরুষের বিড়ম্বনা মাত্র—তাই ইংরেজ রাজের প্রতিই শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়, নিজের প্রতি নয়। রাজশক্তির আছে গায়ের জোর। তার বিরুদ্ধে যদি কর্ত্তব্যের খাতিরে দাঁড়াতেই হয় তাহলে অপরপক্ষে থাকা উচিত চারিত্রিক দৃঢ়তা। অর্থাৎ আঘাতের বিরুদ্ধে সহিষ্ণুতার জোর। কিন্তু আমরা সেই চারিত্রিক জোরটাই ইংরেজ রাজের কাছে দাবী করি, নিজের কাছে নয়; তাতে প্রমাণ হয়েছে, মুখে যাই বলি, নি র অগোচরে ইংরেজকে পূজা করি—ইংরেজকে গাল দিয়ে কোন শাস্তি প্রত্যাশা না করার দ্বারাই সেই পূজার অনুষ্ঠান। শক্তিমানের দিক দিয়ে দেখলে তোমাকে কিছু না বলে তোমার বইকে চাপা দেওয়া প্রায় ক্ষমা। অন্য কোন প্রাচ্য বা প্রতীচ্য বিদেশী রাজার দ্বারা এটি হত না। আমরা রাজা হলে যে হতই না, সে আমাদের জমিদারের ও রাজণ্যের বহুবিধ ব্যবহারে আমরা প্রত্যহ দেখতে পাই। কিন্তু তাই বলে কি কলম বন্ধ করতে হবে? আমি তা বলিনে—শাস্তিকে স্বীকার করেই কলম চলবে। যে কোন দেশেই রাজশক্তিতে সত্যকার বিরোধ ঘটেছে সেখানে এমনিই ঘটবে—রাজবিরুদ্ধতা আরামে নিরাপদে থাকতে পারে না, এই কথাটা নিঃসন্দেহে জেনেই ঘটেছে।

তুমি যদি কাগজে রাজবিরুদ্ধ কথা লিখতে তাহলে তার প্রভাব স্বল্প ও ক্ষণস্থায়ী হত—কিন্তু তোমার মত লেখক গল্পচ্ছলে যে কথা লিখবে তার প্রভাব নিয়ত চলতেই থাকবে। দেশ ও কালে তার ব্যপ্তির বিরাম নেই—অপরিণত বয়সের বালক-বালিকা থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধরা পর্য্যন্ত তার প্রভাবের অধীনে আসবে। এমন অবস্থায় ইংরেজ রাজ যদি তোমার বই প্রচার বন্ধ করে না দিত তাহলে এই বোঝা

যেত যে সাহিত্যে তোমার শক্তি ও দেশে তোমার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে নিরতিশয় অবজ্ঞা ও অজ্ঞতা। শক্তিকে আঘাত করলে তার প্রতিঘাত নেবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। এই কারণেই সেই আঘাতের মূল্য—আঘাতের গুরুত্ব নিয়ে বিলাপ করলে সেই আঘাতের মূল্য একেবারেই মাটি করে দেওয়া হয়। ইতি ২৭শে মাঘ, ১৩৩৩—

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

তার উত্তরে শরৎবাবু যে চিঠির খসড়া করেন, যেটি উমাপ্রসাদবাবুর সৌজন্যে প্রাপ্ত, সেটি 'দরদী শরৎচন্দ্র' গ্রন্থের শেষভাগে মুদ্রিত আছে ঃ

"সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট

জেলা হাওড়া

শ্রীচরণেষু,

আপনার পত্র পেলাম। বেশ তাই হোক। বইখানা আমার নিজের বলে একটুখানি দুঃখ হবার কথা, কিন্তু সে কিছুই নয়। আপনি যা কর্ত্তব্য এবং উচিত বিবেচনা করেছেন তাতে আমার অভিমান নেই, অভিযোগও নেই। কিন্তু আপনার চিঠির মধ্যে অন্যান্য কথা যা আছে সে সম্বন্ধে আমার দুই একটা প্রশ্ন আছে, বক্তব্যও আছে। কৈফিয়েতের মত যদি শোনায় সে শুধু আপনাকেই দিতে পারি।

আপনি লিখেছেন, ইংরেজ রাজের প্রতি পাঠকের মন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। ওঠবারই কথা। কিন্তু এ যদি অসত্য প্রচারের মধ্য দিয়ে করবার চেষ্টা করতাম তাহলে লেখক হিসাবে তাতে আমার লজ্জা ও অপরাধ দুইই ছিল। কিন্তু জ্ঞানতঃ তা আমি করিনি। করলে Politician-দের Propaganda হ'ত, কিন্তু বই হ'ত না। নানা কারণে বাংলাভাষায় এ ধরণের বই কেউ লেখে না। আমি যখন লিখি এবং ছাপাই তার সমস্ত ফলাফল জেনেই করেছিলাম। সামান্য সামান্য অজুহাতে ভারতের সর্বত্রই যখন বিনা বিচারে অবিচারে অথবা বিচারের ভান করে কয়েদ নির্বাসন প্রভৃতি লেগেই আছে তখন আমিই যে অব্যাহতি পাবো অর্থাৎ রাজপুরুষেরা আমাকেই ক্ষমা করে চলবেন এ দুরাশা আমার ছিল না। আজও নেই। তাঁদের হাতে সময়ের টানাটানি নেই। সুতরাং, দু'দিন আগে পাছের জন্য কিছু যায় আসে না। এ আমি জানি, এবং জানার হেতুও আছে। কিন্তু এ যাক্। এ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার কিন্তু বাঙলাদেশের গ্রন্থকার হিসাবে গ্রন্থের মধ্যে যদি মিথ্যার আশ্রয় না দিয়ে থাকি এবং তৎসত্ত্বেও যদি রাজরোষে শাস্তি ভোগ করতে হয় তো করতেই হবে—তা' মুখ বুজেই করি বা অশ্রুপাত করেই করি, কিন্তু প্রতিবাদ কি প্রয়োজন নয়? প্রতিবাদেরও দণ্ড আছে এবং মনে করি তারও পুনরায় প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক। নইলে গায়ের জোরকেই প্রকারান্তরে ন্যায্য বলে স্বীকার করা হয়। এই জন্যেই প্রতিবাদ চেয়েছিলাম। শাস্তির কথাও ভাবিনি এবং প্রতিবাদের জোরেই যে এ বই আবার ছাপা হবে এ সম্ভাবনার কল্পনাও করিনি।

চুরি ডাকাতির অপরাধে যদি জেল হয় তার জন্য হাইকোর্টে আপিল করা চলে, কিন্তু আবেদন যদি অগ্রাহ্যই হয়, তখন দু বছর না হয়ে তিন বছর হল কেন, এ নিয়ে বিলাপ করা সাজে না। .... কিন্তু মোটা ভাতের বদলে যদি Jail authority-রা ঘাসের ব্যবস্থা করে, তখন হয়ত তাদের লাঠির চোটে তা চিবোতে পারি, কিন্তু ঘাসের ডালা কণ্ঠরোধ না করা পর্য্যন্ত অন্যায় বলে প্রতিবাদ করাও আমি কর্তব্য মনে করি।

কিন্তু বইখানা আমার একার লেখা, সুতরাং দায়িত্বও একার। যা বলা উচিত মনে করি তা বলতে পেরেছি কিনা এইটেই আসল কথা। নইলে ইংরাজ সরকারের ক্ষমাশীলতার প্রতি আমার কোন নির্ভরতা ছিল না। আমার সমস্ত সাহিত্য সেবাটাই এই ধরণের। যা উচিত মনে করেছি তাই লিখে গেছি।

আপনি লিখেছেন, আমাদের দেশের রাজারা এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অন্যান্য রাজশক্তির কারও ইংরেজ গভর্ণমেন্টের মত সহিষ্ণুতা নেই। একথা অস্বীকার করার অভিজ্ঞতা আমার নেই। কিন্তু ও আমার প্রশ্নই নয়। আমার প্রশ্ন, ইংরাজ রাজশক্তির এ বই বাজেয়াপ্ত করার justification যদি থাকে, পরাধীন ভারতবাসীর পক্ষে protest করার justificationও তেমনি আছে।

আমার প্রতি আপনি অবিচার করেছেন যে, আমি যেন শাস্তি এড়াবার ভয়েই প্রতিবাদের ঝড় তুলতে চেয়েছি এবং সেই ফাঁকে গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। দেশের লোক যদি প্রতিবাদ না করে, আমাকে করতেই হবে। কিন্তু সে হৈচৈ করে নয়, আর একখানা বই লিখে।

আপনি নিজে বহুদিন যাবৎ দেশের কাজে লিপ্ত আছেন, দেশের বাহিরের অভিজ্ঞতাও আপনার অত্যন্ত বেশি, আপনি যদি শুধু আমাকে এইটুকু আদেশ দিতেন যে এই বই প্রচারে দেশের সত্যকার কল্যাণ নেই, সেই আমার সান্ত্বনা হোত। মানুষের ভুল হয়েছে মনে করতাম।

আমি কোনরূপ বিরুদ্ধ ভাব নিয়ে এ চিঠি আপনাকে লিখিনি। যা মনে এসেছে তাই অকপটে জানালাম। মনের মধ্যে যদি কোন ময়লা আমার থাকতো আমি চুপ করে যেতাম। আমি সত্যকার রাস্তাই খুঁজে বেড়াচ্ছি। তাই সমস্ত ছেড়ে ছুড়ে নির্বাসনে বসে আছি। অর্থে সামর্থে সময় যে কত গেছে সে কাউকে জানাবার নয়। দিনও ফুরিয়ে এলো, এখন সত্যিকার কিছু একটা করবার ভারি ইচ্ছে হয়।

উত্তেজনা ও অজ্ঞতাবশতঃ এ পত্রের ভাষা যদি কোথাও রূঢ় হয়ে থাকে আমাকে মার্জনা করবেন। আপনার অনেক ভক্তের মাঝে আমিও একজন, সুতরাং কথায় বা আচরণে লেশমাত্র ব্যথা দেবার কথা আমি ভাবতেও পারিনি। ইতি—২রা ফাল্গুন, ১৩৩৩, সেবক, শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়"

'শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা' গ্রন্থ হতে কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরা হচ্ছে। শরৎচন্দ্র স্বয়ং লিখেছেন ঃ "সে কি উত্তেজনা! কি বিক্ষোভ! রবীন্দ্রনাথ নাকি 'পথের দাবী' পড়ে

ইংরেজদের সহিষ্ণুতার প্রশংসা করেছেন! এই বইয়েতে নাকি ইংরেজদের প্রতি বিদ্বেষের ভাব আছে বলে মত প্রকাশ করেছেন! আমার 'পথের দাবী' পড়ে আমাদের দেশের কবির কাছে যদি এই দিকটাই বড় হয়ে থাকে তাহলে স্বাধীনতার জন্যে আর আন্দোলন কেন? সবাই মিলে তো ইংরাজদের কাঁধে করে নেচে বেড়ানো উচিত। হায় কবি, তুমি যদি জানতে তুমি আমাদের কত বড় আশা—কত বড় গর্ব, তাহলে নিশ্চয় এমন কথা বলতে পারতে না। কবির কাছে আমার 'পথের দাবী'র যে এত বড় লাঞ্ছনা হবে এ আমার স্বপ্নের অতীত ছিল। কি মন নিয়েই যে আমি এই বইখানা লিখেছিলুম, তা' আমি কারুকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না।"

কবি রবীন্দ্রনাথের চিঠি মন দিয়ে পড়লে, আর শরৎবাবুর পত্র মন দিয়ে পড়লে তাতে কে কতটা ইংরেজ প্রেমিক এবং কে কতটা ইংরেজ বিরোধী ঠিক করতে পারা যাবে। কে সাহসের সঙ্গে শাস্তি নিতে বেপরোয়া, আর কে ইংরেজের প্রশংসা ও শক্তির জয়গাথা গাইছেন তা অনুমান করা শক্ত নয়।

কবি ইংরেজকে তোয়াজ করতেন কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে ওটা অনেকের কাছে যথেষ্ট নাও হতে পারে।

যে সময়ে ইংরেজের ভারত হতে পালাই পালাই রব, যখন স্বরাজ পার্টি আর আজাদী পার্টি এক হয়ে গেছে, খেলাফত আর কংগ্রেস একযোগে লড়ে যাচ্ছে, ইংরেজরা ভারতবাসীকে হাজারে হাজারে গাছের ডালে ফাঁসি দিচ্ছে, করছে মা-বোনদের ইজ্জতহরণ এবং প্রাণ সংহার, দিচ্ছে কারাদণ্ড, যাবজ্জীবন, ইংরেজ ও ভারতবাসী পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে আঘাত প্রত্যাঘাতের ইতিহাস তৈরি করছে —কেউ অস্ত্র আর কেউ কলম নিয়ে যুদ্ধে নেমেছেন—সেই সময় দিল্লীর রাজপ্রাসাদে সমগ্র ভারতের ইংরেজ নেতা সম্রাট পঞ্চম জর্জ স্বর্ণখচিত সিংহাসনে উপবিষ্ট। ঠিক সেই সময় যদি তাঁর তোষণ ও তোয়াজে কেউ কোন কবিতা লিখে উপহার প্রদান করেন তাঁকে বর্তমান ভারতবাসী কোন্ দৃষ্টিতে দেখবেন কে জানে! মনে হয় মন্দ ধারণাই পোষণ করবেন।

কবি রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ঐ সময় সম্রাট পঞ্চম জর্জ-এর জন্য প্রশংসা ও স্তবস্তুতিপূর্ণ কবিতা লিখে তাঁর পদপ্রান্তে উপহার দিলেন। সেটা কোন্ কবিতা ছিল, যাঁরা জানেন না, শুনলে চমকে উঠবেন। সেটাই হচ্ছে—'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা........'।

কবি অন্যায় করেছেন অথবা ভুল করেছেন বললে বিপদ হতে পারে, তাই কথাটাকে যদি ইতিহাসে চাপা দেওয়াই হয়, তাতে আপত্তি নইলে নাই করা যাবে। কিন্তু যে বই-এর নাম 'ইতিহাসের ইতিহাস' অথবা 'ইতিহাসের উৎস' অথবা 'ইতিহাসের নেপথ্যে' অথবা 'ইতিহাসের অন্তরালে' অথবা 'ইতিহাসের জনক' সেখানে বাধা আসবে কেন? যদি বাধা দিতেই হয় তাহলে প্রথমে জাতীয় গ্রন্থাগার ধ্বংস করা

প্রয়োজন। কবিতাটি লেখা যত না দুঃখের তার চেয়ে অতীব আশ্চর্যের ঘটনা—দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বেই কবি পরলোকগমন করেছেন অর্থাৎ ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে, আর দেশ স্বাধীন হয়েছে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে। তখন আর কোন কবিতা কি পাওয়া যায় নি যেটা জাতীয় সঙ্গীত করা যেত? অথবা কোন কবিকে দিয়ে কি তা লেখানো যেত না? পঞ্চম জর্জকে উপহার দেওয়া কবিতাখানাই চালাতে হোল? হায় নেতৃবৃন্দ! হায়রে সুপারিশ! ঐ কবিতাটি 'পঞ্চম জর্জকে উপহার দেওয়া নিয়ে খবরের কাগজে অনেক সমালোচনা হয়েছে। কিন্তু এর তথ্য ব্যারিস্টার এস.এ. সিদ্দীকীর 'ভুলে যাওয়া ইতিহাস' এর ৯৬ পৃষ্ঠায় আছে।

বিধানসভায় শেখর বেরার কাগজ মারফত যেসব অসত্য কথা পৌঁছালো তার ভেদের কথা একটু খুলে বলি। ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ নম্বর অভিযোগ নিয়ে যে আলোচনা করেছি তাতে পরিষ্কার প্রমাণ হয়ে গেছে যে 'ইতিহাসের ইতিহাসে' ওসব কথা মোটেই নেই, আর কিছু কথা বিকৃত। কিন্তু তিনি পেলেন কোত্থেকে? তিনি নিজে যদি বই পড়ে, বই সামনে করে আমাদের মত সাবধানে মিলিয়ে মিলিয়ে উদ্ধৃতি দিতেন তাহলে তা নিখুঁত হোত এবং কেউ তাঁকে অসত্যবাদী বলতে পারতো না অথবা তিনি এত হাস্যাস্পদ হতেন না। সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক মনে করেছেন ছাই-ভস্ম, সত্য মিথ্যা যাই লিখি দু'দিন পরে কাগজগুলো ঠোঙ্গা তৈরি হবে—আর তাতে কেউ মুড়ি খেয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। কিন্তু যাঁরা গ্রন্থাদি লেখেন তাঁদের চিন্তা করতে হয়, এটা বহুদিন থাকবে, বহু মানুষ পড়বেন, গবেষণা করবেন। তাই অনেক সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। অবশ্য সত্যিকারের যাঁদের বড় হওয়ার ইচ্ছা থাকে, সে হোক না ছোট পত্রিকা, হোক না হাতে লেখা পত্রিকা, তাঁরা তাঁদের চরিত্র নষ্ট করতে মোটেই রাজী নন।

নির্বোধ সাংবাদিক আর নির্বোধ সম্পাদক যদি মনে করেন, 'আমি কত বাহাদুর, আমার লেখার চোটে বই বাজেয়াপ্ত হয় তা বিধানসভায় আলোচিত হয়—তাহলে আমি তো খুব দামী লোক!' তাহলে তা সঠিক হবে না।

কেউ যদি বলে অমুক মন্ত্রী ডাকাতি বা ব্যভিচার করে মার খেয়েছেন অথবা তাঁর নিজের কন্যাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিয়েছেন অথবা অমুক সাহিত্যিক আমাদের শত্রুদেশের গুপ্তচর, তাঁর বাড়িতে বোমার কারখানা পাওয়া গেছে তাহলে কাগজ হয়ত খুব বিক্রি হবে এবং অনেক উচ্চ সভায় আলোচনাও হবে কিন্তু পরে তদন্তে দেখা যাবে সব মিথ্যা। তখন সে কৈফিয়ত দেবে আমাকে যিনি তথ্য সরবরাহ করেছিলেন তাঁর অসত্য তথ্য গ্রহণ এবং তা ছাপার জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি। ব্যাস। সাতখুন মাফ। কিন্তু যাঁর কাছে চরিত্রের মূল্য আছে, ভদ্রতার মূল্য আছে তাঁর পক্ষে ওসব সম্ভব নয়। যেমন, কোন লরি ড্রাইভার ইচ্ছে করে কাউকে চাপা দিলে কোর্টে বিচারে তাঁর শাস্তি হওয়া মুশকিল; তাঁর উকিল প্রমাণ করবেন ইঞ্জিন বিকল হয়ে এই অঘটন ঘটেছে। কিন্তু কোন ড্রাইভার আজ পর্যন্ত এইরকম চরিত্রহীনতার

ইতিহাস সৃষ্টি করেননি।

শেখর বেরা 'বহ্নিবার্তা' পত্রিকায় জানালেন 'ইতিহাসের ইতিহাস' স্কুলে পড়ানো হয়। কিন্তু তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। দ্বিতীয় কথা, বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক নন, তিনি ফেল করেছিলেন, পরের বছর ইংরেজ সরকার দয়া করে তাঁকে পাশ করিয়ে দিয়েছিলেন। একথা মোটেই ঐ বইয়ে নেই, সুতরাং এও মিথ্যা। তৃতীয় কথা, 'বেদ না পড়লে হিন্দু হয়না।' একথাও ঐ বইয়ে নেই। অতএব এও মিথ্যা। যাঁদের এই বই আছে তাঁরা অনুগ্রহ করে একবার মিলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন ঐসব সংবাদিক ও সংবাদপত্রের চরিত্রের আসল চিত্র।

বসিরহাট হতে একটা সাপ্তাহিক কাগজ বের হয় তার নাম 'বসিরহাট হিতৈষী'। তার ৫৬ বর্ষ ৩০ সংখ্যায় বড় বড় অক্ষরে ছাপা হোল "'ইতিহাসের ইতিহাস' বইকে কেন্দ্র করে বসিরহাট শহরে উত্তেজনা।" তারপর বইটির বিবরণ দিয়ে লেখক বলেছেন, গোলাম বারী মাষ্টার বসিরহাট স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক যিনি পূর্বে বসিরহাট কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ঐ ৪ পাতার পত্রিকায় প্রথম পাতায় লেখা আছে, "তিনি ইতিপূর্বে বসিরহাট কলেজ, পানিতর স্কুল, ভ্যাবলা স্কুল হতে অপসারিত হয়ে সর্বশেষে বসিরহাট টাউন স্কুলে আসেন। এখানে এসে তাঁর সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপ ছাত্রদের, সহকর্মীদের ও শিক্ষকদের মধ্যে ছড়াতে সচেষ্ট হ'ন এবং যার পরিণতি ২৩ শে জুলাই '৮১-র দুপুরে ঘটে।"

"গোলাম বারী ছাত্রদের কাছে বলেছেন—বিদ্যাসাগর রচিত বর্ণপরিচয় জনৈক মুসলমানের লেখা।"

"বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমবার বি. এ. পাশ করেন নি। পরেরবার ইংরেজকে ধরে বি. এ. পাশ করেছেন।"

"রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তাঁর নিজের কবি প্রতিভায় নয়..."।

লক্ষ্য করুন, এগুলোর জন্য 'বসিরহাট হিতৈষী' লিখলেন, গোলাম বারী বলেছেন। আর শেখর বেরা 'বহ্নিবার্তা'য় সেটা 'ইতিহাসের ইতিহাসে' আছে বলে বেশ একটু ভাষা দিয়ে পালিশ করে চালিয়ে দিলেন। কি সুন্দর চরিত্র সভ্য বাংলার সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদকের!

বসিরহাট হিতৈষী ছোট্ট কাগজ হলেও তার অনেক মূল্য দেওয়া যেত যদি লেখাগুলো শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য হোত। ঐ কাগজে লেখা আছে, "রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন নিজের কবি প্রতিভায় নয়, শুধুমাত্র ইংরেজের তোয়াজ করেই পেয়েছেন।" এতে বইটির পাতার নম্বর দেননি। আসলে এইভাবে এই তথ্য 'ইতিহাসের ইতিহাসে' নেই। এ সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে বেশ কিছুটা। বেশি নিষ্প্রয়োজন।

ইনিও লিখেছেন, "স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় গিয়েছিলেন অর্থ ও বিশ্বসুন্দরী মার্গারেটের জন্য।" এখানেও বইটির পৃষ্ঠার নাম্বার নেই। আর বিবেকানন্দের আলোচনায় বইয়ের কোথাও এই কথাটুকু খুঁজে পাওয়া যাবে না। আসলে তা কিভাবে আলোচনা করা হয়েছে তার পুনরাবৃত্তির আর প্রয়োজন নেই।

অরবিন্দ সম্বন্ধে ঐ পত্রিকায় যেটুকু লেখা হয়েছে তা সরল হিন্দু জনসাধারণকে উত্তেজিত করার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু সেটাও বিকৃত—"শ্রী অরবিন্দ ছিলেন গোঁড়া মুসলমান বিদ্বেষী নেতা (*) অরবিন্দ শুধু মুসলমান জাতির শত্রু ছিলেন না বরং যে কোন অহিন্দু, তাদেরও শত্রু ছিলেন; তাতে ইংরেজরাও পড়ে।" আমার দেওয়া (*) চিহ্নিত স্থানে পাঁচ পাঁচটি লাইন বাদ দিয়ে সব একাকার করে ফেলেছেন সম্পাদকদ্বয়। যদি বাদ দিতেই হয় তাহলে কয়েকটি বিন্দু (...) বসাতে হয়, এটা সাধারণ নিয়ম। এটা শিখতে বিদেশ যেতে হয়না, চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্ররাও জানে।

যদি কেউ অরবিন্দের জন্য 'গোঁড়া মুসলমান বিদ্বেষী' বলে থাকেন তাহলে কি তিনি ভুল বলেছেন? আমি কিন্তু পৈতাধারী গেরুয়া বস্ত্র পরিহিত, টিকিওয়ালা বেদমান্যকারী হিন্দুকে গোঁড়া মনে করি না বরং মনে করি তিনি এক নম্বর নিষ্ঠাবান হিন্দু। তেমনি যিনি দাড়িওয়ালা, টুপিওয়ালা, নামাজি, কোরআন হাদিস-এর অনুসারী তাঁকেও গোঁড়া বলিনা, বলি নিষ্ঠাবান এক নম্বর মুসলমান। অতএব 'অরবিন্দ গোঁড়া মুসলমান বিদ্বেষী' ছিলেন—এটা তাঁর দুর্নাম না হয়ে সুনামও হতে পারে। দ্বিতীয় কথাতে প্রমাণ হয় তিনি মুসলমান ও শাসক ইংরেজের শত্রু ছিলেন। সেই সময়ে শাসক শ্রেণীর শত্রু হওয়া নিঃসন্দেহে প্রশংসার কথা। বাকী রইল মুসলমান জাতির শত্রু হওয়া। এ কথাটা কতখানি সঠিক? 'ইতিহাসের ইতিহাসে' ৬৯১ হতে ৬৯৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত শ্রী অরবিন্দের কথা আছে। যদি কেউ গবেষণার দৃষ্টি দিয়ে পড়েন তাহলে তাঁকে বোধহয় কোন বাজে মন্তব্য করে লজ্জিত হতে হবে না। আসলে যত দোষ নন্দ ঘোষ—মুশকিল হচ্ছে লেখক যে অন্য ধর্মের লোক!

আসুন একটু আলোচনা করি। 'ইতিহাসের ইতিহাসে' যেটুকু আছে যদি এখানে সবটুকুই তুলে ধরি তাহলেই ভুল বোঝাবুঝি শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আমি ভারতের আদর্শ নাগরিক, সরকার যে বই বাজেয়াপ্ত করেছেন তা পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত তার বড় অংশ হুবহু তুলে দেওয়া খুব ভাল মনে করছি না।

শ্রী অরবিন্দ ১৮৭২তে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। বেশ বোঝা যায় সেই যুগ কোন্ যুগ ছিল? ছিল ইংরেজের শাসন, শোষণ ও উৎপীড়নের যুগ। তখন দরকার হয়েছিল ভারতের একতা। শুধুই কোরআনভিত্তিক বা গীতাভিত্তিক সমিতি গড়া দেশের মিত্রের কাজ ছিল না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, জহরলাল, মৌলানা আজাদ, মৌলানা মুহাম্মদ আলী, মৌলানা শওকত আলী, আব্দুল গফফার খাঁন প্রভৃতি মানুষ কম বেশি প্রত্যেকেই হিন্দু মুসলমানের মিলন ও মিলিত চেষ্টায় স্বরাজ বা স্বাধীনতা

আনার স্বপ্ন দেখতেন। সেখানে জিন্নাহ এবং অরবিন্দ অন্য চরিত্রের ব্যক্তি বললে হয়ত শ্রুতিকটু লাগবে। তাই ওসব সেই ইতিহাসে লেখা চলবে না যা সরকারি পাঠ্যপুস্তক। কিন্তু গ্রন্থাগারে সেসব গ্রন্থ থাকবে বৈকি।

উপরে উল্লিখিত নেতারা কেউ শুধু মুসলমান ও হিন্দুর কথাই ভাবতেন তা নয়, বরং ভারতীয় মানুষের কথাই তাঁরা চিন্তা করতেন। কিন্তু অরবিন্দ প্রভৃতি নেতা তার ব্যতিক্রম। প্রমাণ ঃ [১] অরবিন্দের জন্য সৌরেন্দ্রবাবু তাঁর পুস্তকের ২৫৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "শক্তির বোধনকল্পে তাঁরা কালী, দুর্গা, ভবানী, বগলা প্রভৃতি দেবীর পূজা করতেন। শিবাজী ছিলেন তাঁদের আদর্শ। বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও দয়ানন্দ সরস্বতীর হিন্দু ধর্মের পুনর্জাগরণ চিন্তাকে অনেকাংশে ভিত্তি করে এই ধারা গড়ে ওঠে।" [২] ২৬০ পৃষ্ঠায় আরও আছে, "পূর্বতন আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদকে তাঁরা হিন্দু পুনর্জাগরণে পরিমিশ্রিত করেন। পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায় ছিলেন মুসলমান ও অহিন্দু ধর্ম বিরোধী আর্য সমাজে দীক্ষিত। মহারাষ্ট্রে হিন্দু অতীতের [অর্থাৎ হিন্দু রাজত্ব] পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে লোকমান্য বালঙ্গাধর টিলক, গণপতি ও শিবাজী উৎসবের সঙ্গে গোরক্ষা আন্দোলনের সূত্রপাত করেন।" মনে রাখার কথা হচ্ছে লাল, বাল, পাল ও অরবিন্দ এঁরাই হচ্ছেন ঐ সংগঠনের মাথা। [৩] "পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ধারার ভগীরথ লাল, বাল, পাল ও অরবিন্দ প্রমুখ 'জাতীয়তাবাদী'রা ভক্তিবাদ, অবতারবাদ, লীলাবাদ, অলৌকিকত্ব প্রভৃতিতে বিশ্বাস করতেন।" [৪] "জনশক্তির বোধন ও শত্রু-নিধনকল্পে বরোদায় অরবিন্দ বগলা মূর্তি গড়িয়ে পূজা করেন ১৯০৩ সালে। গুপ্ত সমিতিতে নবাগত কর্মীদের তিনি এক হাতে গীতা এবং অপর হাতে তলোয়ার দিয়ে বিপ্লবের শপথ গ্রহণ করাতেন। লাল, বাল, পাল নামে অভিহিত এই তিনজন আর অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন চরমপন্থী দলের প্রধান চার স্তম্ভ।"

প্রথম প্রথম রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, প্রমথনাথ মিত্র, সরলা দেবী ঐ দলের সদস্য ছিলেন। কিন্তু ভিতরের গুপ্ত কাণ্ডকারখানা দেখে তাঁরা প্রতিবাদ করে ফল না হওয়ার পর ওখান থেকে পিছিয়ে আসেন। [শ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা', পৃষ্ঠা ২৬১-২৬২]

ভারতের মুসলমান জাতি হিন্দুদের পরেই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এদের বাদ দিয়ে এই রকম ভূমিকা ভারতের পক্ষে বিরাট ক্ষতির সৃষ্টি করে। মুসলমান জাতি তখন অনুভব করে যে, তাদের তাহলে সংগঠিত হতে হবে। ঠিক ঐ সময় [৫] "১৯০৬ সালে ঢাকায় নবাব সলিমুল্লার প্রাসাদে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দু মুসলমানের এই বিভেদকে ইংরেজ সযত্নে লালন ও সদ্ব্যবহার করে।" উপরোক্ত ১ নম্বর হতে ৫ নম্বর পর্যন্ত উদ্ধৃতিগুলো ভারতেরই নাগরিক শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের ঐ বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

"উচ্চ শিক্ষার জন্য শৈশবেই অরবিন্দকে বিলাতে পাঠানো হয়। আই. সি. এস. পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েও অশ্বারোহণে স্বেচ্ছাকৃতভাবে অবতীর্ণ না হয়ে তিনি সার্ভিসে যোগদানের অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। ..... কিন্তু দেশের পুনরুজ্জীবনকল্পে

হিংসাত্মক কর্মপন্থা গ্রহণ করেন।" [ঐ পুস্তক, পৃষ্ঠা ২৬১ ও ২৬৭]

অরবিন্দ যখন জেলে যান তখন জেলের অত্যাচারে তাঁর ভাবান্তর হয়। রাজনীতি করা ঠিক নয় বরং ঠাকুরের সাধনা করাই ঠিক, এই ভেবে তিনি চিরদিনের মত রাজনীতি হতে বিদায় নিয়ে আশ্রয় খুঁজলেন পণ্ডিচেরির দিকে। আর সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

জেল থেকে বের হয়ে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, "এখন সকলের কর্তব্য যোগস্থ হয়ে সাধনা করা। ভগবানে আত্মসমর্পণ করাই হল যোগসাধনার প্রথম পদক্ষেপ। কারাগারে তিনি বাসুদেবের [দেবতার] এই মর্মে আদেশ পেয়েছিলেন" [ঐ পুস্তক, ২৭০ পৃষ্ঠা]। "বিপ্লববহ্নি প্রজ্জ্বলিত করে সহসা তাঁর রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ানোকে অনেকে তাঁর দায়িত্বজ্ঞানহীন পলায়নী মনোবৃত্তি বলে মনে করেন।" [ঐ পুস্তক, পৃষ্ঠা ২৯৪]

এখনো যদি অরবিন্দকে কেউ ভালভাবে যাচাই করতে চান তাহলে উপরের উদ্ধৃতিগুলো আরও কয়েকবার মন দিয়ে পড়ুন। মুসলমান জাতিকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে যেভাবে তিনি 'দেশোন্নতি'র ভূমিকা নিতে চেয়েছিলেন তাতে দেশের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে বলেই ঐতিহাসিকেরা মনে করেন। অরবিন্দ-তথ্য জানতে আর যেসব বইপুস্তক আমাদের সাহায্য করেছে তার কয়েকটি জানিয়ে দিচ্ছি, গবেষণা করতে সুবিধা হবে—

'শ্রী অরবিন্দের জীবন-কথা ও জীবন-দর্শন,' লেখক প্রমদারঞ্জন ঘোষ, প্রমোদ কুমার সেন লিখিত 'শ্রী অরবিন্দ ঃ জীবন ও যোগ', শ্রী অরবিন্দের লেখা 'অরবিন্দ মন্দিরে,' 'দিব্যজীবন', 'ধর্ম ও জাতীয়তা', গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর লেখা, 'শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙ্গলা স্বদেশীযুগ', যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখিত 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি', যোগেশচন্দ্র বাগল লিখিত 'ভারতের মুক্তি সন্ধানী', অমলেশ ত্রিপাঠির লেখা The Extremist Challenge, বিপিনচন্দ্র পালের লেখা Memories of My Life and Times, কালীচরণ ঘোষের লেখা The Role of Honour, এইচ. মুখার্জী এবং ইউ. মুখার্জী ঃ Sri Aurobindo's Political Thought, শ্রী অরবিন্দের লেখা The Spirit and Form of Indian Policy, The Ideal of Human Unity এবং The Doctrine of Passive Resistance প্রভৃতি।

শিবাজীকে আদর্শ করে নেওয়া নেতাদের পক্ষে ভুল হয়েছিল; ভারতে কি কোন যোগ্যতর হিন্দু ছিলেন না যাঁকে আদর্শ করা যায়? ঐ বর্গী মারাঠাকেই আদর্শ করতে হবে? তাঁর থেকে রাণা প্রতাপসিংহ কি যোগ্য ছিলেন না? আচ্ছা, যদি আমি বলি আকবরের এত প্রশংসা করা হয়েছে তাঁকে আদর্শ করলে কেমন হোত? তাহলে আমাকে শুধু পাগল বলা হবে তাই নয়, বলা হবে—ভারতকে আবার নতুন 'রাষ্ট্র' বানাতে চায়। কমপক্ষে একবার তো আকবর উৎসব হওয়া দরকার ছিল! তাহলে

বোঝা যেত অরবিন্দের মধ্যে মুসলমান-বিদ্বেষ ছিল না। হয়ত কেউ ভাবতে পারেন তাঁর মাথায় ওকথা আসে নি। বিপিন পাল তাই-ই বলেছিলেন, কিন্তু অরবিন্দের পক্ষে তা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। বিপিনচন্দ্রের মতে ঃ "শিবাজী উৎসবের মত আকবর উৎসব পালন করা হলে দেশভক্তি আরও পূর্ণাঙ্গ হবে।" [বাঙ্গালীর রাষ্ট্রচিন্তা, পৃষ্ঠা ২০৩ দ্রষ্টব্য]

ভারতের বীর বিচারকদের পবিত্র নিরপেক্ষ বিচারের ফলাফলে রাজনৈতিক বন্দী বই 'ইতিহাসের ইতহাস' যদি মুক্তিলাভ করে, আর যে কোন সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যদি পূর্ণভাবে তা পড়েন তাহলে আমাকে আর কোন প্রশ্ন করার দরকার হবে বলে মনে হয় না।

আমাকে 'বহ্নিবার্তা' এবং 'বসিরহাট হিতৈষী' পত্রিকাগুলোতে উৎকট উদ্ভ্রান্ত মুসলমান দরদী আর হিন্দু-বিদ্বেষী প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। তার উত্তরে বলতে পারি ঐ বইয়ের ৭৪৮ পৃষ্ঠা হতে ৭৫০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মহাম্মদ আলী জিন্নার ইতিহাস লেখা আছে। কোন উৎকট মুসলমান প্রেমিক পাকিস্তান বা ইসলামী রাষ্ট্রের সমর্থক জিন্নাহ সম্বন্ধে একথা কি লিখতে পারে?— "জিন্নাহ্ দেশ বিভাগ করে পাকিস্তান সৃষ্টি করে সারা ভারতের চরম ক্ষতি করেছেন।" "জিন্নাহ ইসলাম ইসলাম বলে চিৎকার করলেও সেটা ছিল প্রহসন আর অভিনয় মাত্র।" এগুলো কি 'ইতিহাসের ইতিহাসে' ৭৪৮ ও ৭৪৯ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে না?

জিন্নাহ সাহেবী মুসলমান অর্থাৎ তাঁর মুখে দাড়ি ছিল না, নামাজও নিয়মিত পড়তেন না, স্যুট পরা বিলেতি পরিবেশের মানুষ, তাই বলে হয়তো আমি তাঁর জন্য ঐ কড়া কথা লিখেছি। তাহলে স্বভাবতই বড় দাড়ি, মাথায় টুপি, ভারতের ইতিহাসের রত্ন, একটি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মদাতা স্যার সৈয়দ আহমাদ সম্বন্ধে নিশ্চয় চলতি ইতিহাসের বিপক্ষে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। 'ইতিহাসের ইতিহাসে' ৭৫০ হতে ৭৫৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত স্যার সৈয়দ আহমাদের আলোচনা আছে। কিন্তু সেখানে কি লেখা হয়নি যে তিনি ইংরেজের হাতে গড়া মানুয ছিলেন? —[১] সরকার নিঃশব্দে তাঁকে একটি সরকারি পোষ্টে সেরেস্তাদারের পদ দান করেন। [২] কিছুদিন পর সেই অর্ধশিক্ষিত লোকটিকে ইংরেজি শেখাবার ব্যবস্থা করেন। [৩] তারপর তাঁকে মোনসেফের পদ দান করা হয়। পরের পদক্ষেপে তিনি সাবজজ্ হয়ে যান। [৪] স্যার সৈয়দ দেশবাসীর বা জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলেও ইংরেজের সঙ্গে সততা বজায় রাখতে তিনি সমস্ত রকম ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। ইংরেজের নেমক খেয়ে তিনি তাদের সঙ্গে কখনও নেমকহারামি করেন নি। [৫] স্যার সৈয়দ আহমাদ ইংরেজ মনিবের আদেশে বহু ইংরেজি বই অনুবাদ করেন। তারপর সৈয়দ আহমাদকে ইংলণ্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে উত্তমরূপে ট্রেনিং দিয়ে আবার ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়। এরপর একটি সোসাইটি তৈরি করা হয়। যেটির নাম Socity for Education and Progress of Indian Muslims। তারপর হয় মহামেডান ওরিয়েন্টাল

আলিগড় কলেজ। সেটাই হয় বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁর কাজ ছিল মুসলমান বিপ্লবী জাতিকে ইংরেজ ভক্ত করা। [৬] ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু বিদ্বেষের বীজ বপণের ব্যবস্থা এবং ইংরেজের প্রতি আনুগত্যের জ্ঞান দেওয়ার উপর জোর দেওয়া হয়। তারই ফলস্বরূপ ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত নেতারা এবং আলিগড় আন্দোলনের নেতারাই মুসলিম লীগের জন্ম দেন; আর সেই নবজাতককে সযত্নে গড়ে তোলেন মিঃ জিন্নাহ্।

প্রত্যেক পাঠককে নিরপেক্ষতা নিয়ে বিচার করতে বলছি—কোন হিন্দু বিদ্বেষী লেখকের পক্ষে ঐ সমস্ত লেখা কি কোন প্রকারে সম্ভব? কিন্তু উপরের লেখাগুলো আমারই কিনা তা আমার বন্দী হওয়া 'ইতিহাসের ইতিহাসে' ৭৫০ থেকে ৭৫৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। বার বার বলেছি, বলছি এবং বলব যে, স্কুল কলেজে যাই পড়ানো হোক আর সেসব বইয়ে সরকার নিয়ন্ত্রিত যে তথ্যই থাক, গবেষণামূলক বেসরকারি বইয়ে খাঁটি তথ্য বজায় রাখতে হবে বর্তমান ও আগামী দিনের গবেষক ও সত্য পিপাসুদের জন্য।

প্রাচীন ভারতের তথা পৃথিবীর অবস্থা যদি কেউ জানতে চান আর যদি তাঁকে নিম্নোক্ত তথ্য পরিবেশন করা হয় তাহলে কেমন হবে? [১] —"দীর্ঘতমা নামে এক বৃদ্ধ অন্ধ ঋষি যযাতির বংশজাত পূর্বদেশের রাজা মহাধার্মিক পণ্ডিতপ্রবর সংগ্রামে অজেয় বলির আশ্রয় লাভ করেন এবং তাঁহার অনুরোধে তাঁহার রাণী সুদেষ্ণার গর্ভে পাঁচটি পুত্র উৎপাদন করেন। ইহাদের নাম অঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম ও বঙ্গ।"

এক পুরুষ অপর পুরুষের স্ত্রীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করবেন কথাটা শুনতে খারাপ লাগলেও এটা পুরাণ ও মহাভারতের কথা। [দ্রষ্টব্য রমেশচন্দ্র মজুমদারের লেখা 'বাংলাদেশের ইতিহাসে'র (প্রাচীন যুগ) পৃষ্ঠা ১৩]

[২] "শূদ্রাকে বিবাহ করা অসঙ্গত, কিন্তু তাহার সহিত অবৈধ সহবাস করা তাদৃশ নিন্দনীয় নয়।" যদি এই কথা ভারতের বা বাংলার আগেকার অবস্থা বলতে গিয়ে আমার বইয়ে লেখা থাকে তাহলে পত্রিকাওয়ালারা কাগজে তা গরম গরম ভাষায় লিখে বিধানসভায় দিলেই আমি অপরাধী হয়ে যাব। কিন্তু যখন সকলে জানতে পারবেন ওটা আমার কথা নয় তখন অসত্য প্রচারকদের সম্মান অটুট থাকবে তো? এবার জেনে নিন, দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটিও শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদারের ঐ পুস্তকের ১৯৩ পৃষ্ঠায় আছে, যেটা ১৩৭৩ বঙ্গাব্দে ছাপা।

যদি ঐ বাজেয়াপ্ত বইয়ে লেখা থাকে যে, সে যুগে কবি বিষ্ণুমন্দিরে দেবদাসীগণকে নিয়ে নানা যৌন আচার-অনুষ্ঠান পালিত হোত এবং কবিমন্দিরে প্রায় একশত মত প্রথম শ্রেণীর উগ্র সুন্দরী দেবদাসী বিরাজ করত, তাদের রূপ যৌবন চেহারা দেখলে মাত্র কামশক্তি নষ্ট হওয়া পুরুষের যৌনক্ষমতা সঙ্গে সঙ্গে পুনরুজ্জীবিত হয়ে যেত—তাহলে কী প্রতিক্রিয়া হবে বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু

এ তথ্যও রমেশচন্দ্র মজুমদারের ঐ পুস্তকের ১৯৩ পৃষ্ঠায় আছে। ঐ মূল্যবান গ্রন্থটি কোন চটি পুস্তিকা নয়, ভূমিকা-সূচীপত্র ছাড়া ২৫২ পৃষ্ঠার বই। সঙ্গে আছে বহু মূল্যবান প্রাচীন চিত্র, পর পর ৩১টি। আর রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্বন্ধে মন্তব্য করাই বাহুল্য।

ছিদ্র অন্বেষকদের শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে করিয়ে দিই, যাঁরা পরধর্ম বিদ্বেষী হন তাঁরা সকলকেই সেইরকম ভাবেন। যাঁরা কেউ গোটা বই পড়লেন না, তাঁরা কোন্ সততার খাতিরে কাগজে তা লিখে ফেললেন? আমি একজন মুসলমান লেখক হয়ে কী করে প্রাচীন আরবের কথা লিখতে পারলাম? যেহেতু আমি মুসলমান অতএব আরবের আর মুসলমানদের দেশের সব কিছুই ভাল বলতে হবে, এটা সম্ভব? আমি ঐ পুস্তকে নির্দ্বিধায় লিখেছি ঃ "......আরব পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পাপ কেন্দ্র হয়েছিল। নরহত্যা চলত কথায় কথায়। সামান্য উটকে জল খাওয়ানো নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়ে যেত এবং যুগ যুগ ধরে চলতে চলতে ক্রমে তা রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে রূপ নিত।" আরও কি লেখা নেই যে, "সুদ, মদ, জুয়াখেলা, ব্যভিচার ইত্যাদি খুব ব্যাপকভাবে চলত এবং বিয়ে বলে যা ছিল তা ব্যভিচারেরই নামান্তর মাত্র। এমনকি স্ত্রীর গর্ভধারিণী মা অর্থাৎ শ্বাশুড়ীও বিবাহের ইন্ধন হত এবং জড়পূজার দিকদিয়েও মাত্রা চরমে পৌঁছেছিল। ঠাকুর দেবতা ছাড়া এক পাও যেন অগ্রসর হওয়া যায় না। যদি পথে সঙ্গে কোন দেব-দেবী ভুল ক্রমে না আনা হোত তখন পথিমধ্যে মূর্তি তৈরি করেও পথ চলতে হোত।" [দ্রঃ ইতিহাসের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ২২,২৩] এবার মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে আমি লেখকের ধর্ম ও নীতিতে অটল আছি কিনা।

যদি আমি প্রকৃত ইতিহাস ও ঐতিহাসিক সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতকে ইতিহাস বলে স্বীকার না করে থাকি তাহলে কি কাগজওয়ালাদের লিখতে হবে যে, মেমারীর গোলাম আহমাদ মোর্তজা আমাদের বেদ পুরাণ মানেন না, আর আকাশবাণীতে কি জানিয়ে দেওয়া হবে যে, হিন্দুদের ধর্ম-বিশ্বাসে আঘাত হানার জন্য বই বাজেয়াপ্ত হোল? আমি যদি এ কথা লিখে থাকি তাহলে কি অপরাধ হয়েছে?

"আমরা আদি ইতিহাস আলোচনা করে দেখব যে ভারতবর্ষের আদি ইতিহাস বলতে বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ও পুঁথিপত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেগুলোর অধিকাংশ সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত। অবশ্য বিরোধীপক্ষ বা শত্রু-পক্ষ অনেক কিছু বলতে পারেন কিন্তু মিত্রপক্ষ যা বলেন তা অগ্রাহ্যের নয় অবশ্যই।" "ইতিহাস আর ধর্মগ্রন্থ এদুটিকে পৃথক পৃথক বিষয় মনে করা উচিত, কারণ ধর্মের ছায়াবলম্বনে কোন এক ধর্মাবলম্বী জাতি পরিচালিত হয়।" আর ইতিহাস পরিচালিত হয় মানব জাতির বিদ্যাপ্রসূত অভিজ্ঞতার ছায়ায়।

এইবার যদি বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতকে "ধর্মগ্রন্থ বলে সম্মান প্রদর্শন করা হয় তবে সেগুলোকে ইতিহাস গ্রন্থ বলে ছোট করতে অবশ্যই আপত্তি আছে

[ইতিহাসের ইতিহাস, ৩৭-৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]। ঐ লেখাগুলো মন দিয়ে দেখলে কোন অল্প বুদ্ধিমান মানুষও লেখককে সম্প্রদায়িক বা স্বেচ্ছায় ধর্মে আঘাত দিয়েছেন বলতে পারবেন না।

ইতিহাসের আলোচনা করতে হলে যদি প্রসঙ্গক্রমে হিন্দু ভ্রাতাদের রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, পুরাণ এবং মুসলমানদের কোরআন ও হাদিসের কিছু আলোচনা হয় তাতে যদি কোরআন বা বেদ বিরোধী কোন কথা থাকে আর সেই কথাটুকু লেখকের না কোন উদ্ধৃতি, এতটুকু বোঝবার ক্ষমতা যদি কারও না থাকে তাহলে সেই বই পড়ার তিনি উপযুক্ত নন এবং ঐ বিষয়ে কলম ধরার অধিকারও তাঁর নেই বলেই আমি মনে করি। বাজেয়াপ্ত হওয়া বইয়ের ৩৮ পৃষ্ঠায় আমার লেখা এ কথাটা কি তাঁরা পড়েন নি—মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ 'কুরআন শরীফ' স্বয়ং আল্লাহরচিত সংবিধান। তাতে ইতিহাসের ইন্ধন মিললেও কোনক্রমেই তা শুধুমাত্র ইতিহাস হতে পারে না—এই কথার উপর মুসলমানরা রেগে উঠলে ঠিক হবে কি? ঐ বইয়ের ৩৮ পৃষ্ঠায় একথা কি লেখা নেই।—"বেদ, পুরাণ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কোরআন শরীফ প্রভৃতি যদি নির্ভুল ঐশী গ্রন্থ হয় তাহলে ইতিহাস শ্রেণীতে অন্যান্য পুস্তক দাঁড় করাতে হয়। কিন্তু আমাদের প্রাচীন ভারতে সঠিক প্রাণবন্ত ইতিহাস বলতে কিছু ছিল না।" ঐ লেখায় হিন্দু মুসলমানকে এক তুলাদণ্ডে বিচার করা হয়েছে কিনা ভারতবাসী চিন্তা করবেন না?

আমি নাকি ধর্মবিশ্বাসের উপর আঘাত দিয়েছি। খবরের কাগজ ও রেডিও তারই সাক্ষী দিয়েছে। যেমন আমি হয়ত বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির বিরুদ্ধে খারাপ কথা লিখেছি। যদি এটা সত্যি হয় তাহলে নিশ্চয় আমি ভুল করেছি। কিন্তু যদি ইতিহাস ও ধর্মগ্রন্থ দুটি এক জিনিস হয় অথবা ওগুলোতে যে মানুষ ভেজাল প্রদান করেছিল বা করতে চেষ্টা করেছিল সেকথা যদি কারো উদ্ধৃতি দ্বারা প্রমাণিত হয় তাহলেও কি অপরাধ হবে? আমি আগে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে বলি, তারপর মুসলমানদের সম্বন্ধে বলব। বেদ সম্বন্ধে হিন্দু ভাই-বোনেদের বিশ্বাস যে, "ইহা আদি গ্রন্থ, ইহার কোন পরিবর্তন বা বিকার আজ পর্যন্ত সংঘটিত হয় নাই। বেদমন্ত্রগুলি দীর্ঘকাল ধরিয়া আর্য মুনি ঋষিদের কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া আসিয়াছে এবং শিক্ষার্থী গুরুগৃহে অবস্থান করিয়া তাঁহার বর্ণিত ঐ মন্ত্রগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া আসিয়াছে" [দ্রষ্টব্য ঐ গ্রন্থ, ৪৯ পৃষ্ঠা]। কই পত্রিকাওয়ালারা কাগজে এ কথাটা ছাপালেন না? ঐ উদ্ধৃতিটি সংগ্রহ করা হয়েছে অন্য লেখকের বই থেকে।

"এতাদৃশ মূল্যবান বেদের আজ কেন এত অল্প প্রচার। একটু প্রণিধান করিলেই তাহা বোধগম্য হইবে। কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের অবসানে ভারত মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। মহাযুদ্ধের সহিত আর্যগৌরবরবি [বেদ ও ধর্মগ্রন্থগুলি] যে চিরতরে অস্তাচলে গমন করিয়াছিল সে বিষয়ে বোধ হয় মতদ্বৈধ নাই।.... দুঃখের সঙ্গে বলিতে হইতেছে প্রবল পরাক্রান্ত মগধের নাগবংশীয় মহানন্দী সুত, সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের

রাজ্যাভিষেক হইতেই আর্য্য রাজ্য বিলোপ হইয়া ক্ষত্রীয় ধর্ম ভারত হইতেই অন্তর্হিত হইয়াছে।" "পরবর্তীকালে বঙ্গে তান্ত্রিক ধর্ম প্রচারের পৃষ্ঠপোষক মহারাজাধিরাজ বল্লালসেনের নিয়োজিত আগমোক্ত শাস্ত্রবাণী—'কলিতে বৈদিক মন্ত্রশক্তি লোপ পাইয়াছে', 'বেদমন্ত্র কার্য্যকরী নহে', 'যাগযজ্ঞ নিষ্ফল' ইত্যাদি প্রবচনে বেদের আলোচনা একেবারে রহিত হইয়া গেল। স্বধর্মনিরত নিষ্ঠাবান বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্মের আবরণে, প্রাণপণে যে সকল গ্রন্থাদি সংগোপনে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাও গ্রীক, রোমান, পারসিক, তুরাণ, আফগান প্রভৃতি বৈদেশিকগণের বারংবার আক্রমণে বিলুণ্ঠিত ও ভষ্মীভূত হইয়া বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।"

এই কথাটা আমার হলে বই বন্দী করে মৃত্যু ঘটানো যায় কিন্তু বিচারকের আদালতে এটা নিশ্চয় প্রমাণিত হবে যে, এটা লেখকের নিজের উক্তি, না উদ্ধৃতি?

'ইতিহাসের ইতিহাসে' আছে বলে কর্মব্যস্ত মন্ত্রীদের এটুকু আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বইটি বাতিল করিয়ে খুব বিরাট কাজ করলেন বলে যাঁরা মনে করেছেন তাঁরা ভুল করেছেন। আজ না হয় কাল ইতিহাস মাথা তুলে দাঁড়িয়ে সাক্ষী দেবে কোন্‌টা বিচার, আর কোন্‌টা লেখনীর উপর অবিচার? ওটা বিখ্যাত লেখক, ঋগ্বেদের ভাষ্যকার পণ্ডিত মহেন্দ্রচন্দ্র রায়, তত্ত্বনিধি বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের ঋগ্বেদের ভাষ্য হতে নেওয়া হয়েছে এবং পরলোকগত বিখ্যাত লেখক আকরাম খাঁন লিখিত 'মোসলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসে'র ২২-২৩ পৃষ্ঠাতেও এই তথ্য আছে।

ঋগ্বেদ সম্বন্ধে 'ইতিহাসের ইতিহাসে' লম্বা আলোচনা হয়েছে, সেটা পড়লে মনে হবে যেন আমি ঋগ্বেদ বিরোধী কথা লিখেছি—অর্থাৎ ওগুলো স্রষ্টার রচনা নয়, মানুষের রচনা। যেমন ৫১ পৃষ্ঠায় আছে—"ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, বেদের মন্ত্রগুলি বহুদিন যাবৎ ভারতে বসতি স্থাপনকারী আর্য্যদের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে ছিল। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লোক এই মন্ত্রগুলি রচনা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের বংশধর ও শিষ্যগণ উহা সংরক্ষণ করিয়াছেন। যখন মন্ত্রগুলির সঙ্গে সঠিক পরিচয় কমিয়া আসিয়াছে—এমনই এক অন্ধভক্তির যুগে উহাকে ঐশীবাণী বলিয়া গ্রহণের প্রবণতার উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। এইসব যুক্তিতর্ক ছাড়াও স্বয়ং বেদের মন্ত্রগুলিই মানুষের দ্বারা রচিত হওয়ার প্রমাণ বহন করিতেছে। বহু মন্ত্ররচনাকারী তাহার নাম মন্ত্রের সঙ্গে যোগ করিয়া দিয়াছেন।"

এবার লক্ষ্য করুন লেখাটুকু সাধুভাষায় আছে। আমার বর্তমান নিষিদ্ধ বইয়ে ঐ তথ্য আছে, কিন্তু ওটা তো উদ্ধৃতি। দ্রষ্টব্য 'মোসলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসে'র ২৭ পৃষ্ঠা। তার লেখকও একজন মুসলমান। যদি কারো কাছে লেখকের মুসলমান হওয়াটাই অপরাধ হয় তাহলে তিনি কোত্থেকে ঐ তথ্য পেয়েছেন তা জানাচ্ছি — Aspirations from a Fresh World গ্রন্থের এক ও দুই পৃষ্ঠা। মূল গ্রন্থে আছে : There can be no doubt that the Vedic Mantras long remained

scattered among the various groups of Aryan settlers in India.... বেশ বড় উদ্ধৃতি তাই বাড়াচ্ছি না। ঐ বিখ্যাত ইংরেজী বইটি যাঁর লেখা তিনি মুসলমান নন, তিনি হচ্ছেন Shakuntala Rao Shastri। ঐ সমস্ত হিন্দু বিদ্বান ও বিদুষীদের লেখায় যদি প্রমাণই হয় যে, ওগুলো মানুষের রচিত তাহলে তো ইতিহাস প্রসঙ্গে আর কথাই নেই। কারণ ইতিহাস মানুষের সৃষ্টি, তাতে কিছু ভুল থাকাও স্বাভাবিক। ভুল মানুষেরই হয়। এখন আমাকে যদি কেউ বলেন মুসলমানদের হাদিস আল্লাহর রচনা, মানুষের নয়; তাতে আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাবো। কারণ হজরত মুহাম্মদ [সঃ] মানুষ ছিলেন; তিনি অতিমানুষ, মহামানুষ, শ্রেষ্ঠতম মানুষ, শেষ নবী সব মেনে নিলেও তিনি মানুষ ছিলেন না, একথা মানতে রাজী নই। এবং হজরত মুহাম্মাদের বলা, করা ও সমর্থিত কাজেরই নাম হাদিস। সেগুলো যাঁরা সংগ্রহ করে লিখেছেন তাঁরাও মানুষ, কেউ দেবতা নন। যাঁরাই হাদিস লিখে গেছেন তাঁরা সকলেই সৎ ছিলেন। অসৎ মানুষের দ্বারা অনেক নকল হাদিস সৃষ্টি হয়েছে, তাই হাদিসের ভাগ করতে বাধ্য হতে হয়েছে — যে হাদিসগুলো শুদ্ধ সেগুলোর নাম 'সহিহ' হাদিস, যেগুলো নকল সেগুলো 'মওজু' হাদিস, আর যেগুলো সন্দেহজনক, দুর্বল প্রমাণে প্রমাণিত সেগুলোর নাম 'জইফ' হাদিস। আমার এই কথাগুলোকে কেন্দ্র করে কোন উগ্রপন্থী মুসলমান যদি হৈহৈ করে সেটাকে ধর্মের বিরোধিতা বলেন তাতে হতাশ হবার কারণ নেই।

কাগজওয়ালাদের বলি এই ধরণের আলোচনা 'ইতিহাসের ইতিহাসে' কি তাঁরা দেখতে পাননি? দেখেছেন নিশ্চয়, কিন্তু সেগুলো প্রকাশ করলে তাঁদের মতলব হাসিল হোত না। 'ইতিহাসের ইতিহাসে' ৮১১ হতে ৮১৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ঐ তথ্য আছে—কেমনভাবে হাদিসে ভেজাল দেওয়া শুরু হয়, কে প্রথমে এই কুকর্ম করে, কিভাবে গভর্ণর খালেদের সময় তার প্রাণদণ্ড হয়, ঐ ভেজাল প্রতিরোধ করতে বিশ্বের ধর্মদরদী পণ্ডিতগণ কি ব্যবস্থা নিলেন এবং কিভাবে আজ সহিহ হাদিসে বিশ্বাস রাখা সম্ভব হয়েছে তার সুদীর্ঘ আলোচনা আছে।

এইভাবে রামায়ণ ও মহাভারতের জন্য আমার লেখায় পেয়েছেন, "রামায়ণ মহাভারত কিন্তু কাব্যের বই, ইতিবৃত্ত নহে। সত্য সত্য রাম ও যুধিষ্ঠির নামে কোন রাজা ছিল কিনা তাহা বলা যায় না।" কিন্তু লেখাটি কি আমার? ওটাতো শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, এম. এ., পি-এইচ, ডি., ডি.লিট.ডিগ্রীধারী পণ্ডিতের লেখা এবং এই উদ্ধৃতি অবিভক্ত বঙ্গের সরকার অনুমোদিত হাইস্কুলের সিলেবাসভুক্ত পাঠ্য ইতিহাসের ১৭ পৃষ্ঠার পাদটীকায় রয়েছে।

ঐ ইতিহাস যদি আদালত হতে উদ্ধার না হয় অথবা বিধানসভার মতের পরিবর্তন না হয় তাহলে দেশবাসী ইতিহাসের এজলাসে তাঁদেরকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবে বলে আশা রাখি না।

তিনিই আদর্শ পাঠক হতে পারেন যিনি যেটা পড়বেন শুধু চোখ দিয়ে পড়া নয়,

কাগজে শেষ করা নয়, মন দিয়ে অনুভব করা এবং লেখার মুল উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা, তার গ্রহণযোগ্য বস্তু অর্জন করা, বর্জনীয় বস্তু বর্জন করা—তাহলেই হবে পড়ার স্বার্থকতা। তবে যদি কলম ধরতেই হয় কোন লেখা বা বইয়ের পক্ষে বা বিপক্ষে তাহলে লেখাটুকু সম্পূর্ণ পড়তে হবে। আগে পিছে চিন্তা করে তবেই কলম ধরা উচিত।

মনে করুন, আমি লিখবো আমাদের বঙ্গদেশের হিন্দুরা রামকে পবিত্র মনে করে সম্মান করেন কিন্তু রাবণকে অত্যাচারী এবং সীতা হরণকারী বলে অভিহিত করেন। আসলে কিন্তু রাবণ রাম অপেক্ষা আরও সুসভ্য ও শ্রেষ্ঠতর ছিলেন। অন্ততঃ দুইজনই সমান সভ্য ছিলেন। ব্যাস! তাহলে আর রক্ষা নেই। 'বহ্নিবার্তা' আর 'বসিরহাট হিতৈষী'র মত কাগজের জেহাদ শুরু হয়ে যাবে, হাজির হবে একেবারে বিধানসভায়!

এবার যদি প্রমাণ দিই যে কথাটা ভারতের অমুক লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত অমুক বইয়ে আছে, তখন ঢোক্ গিলে এই কথাই বলতে বাধ্য হতে হবে, আজে বাজে লেখক যা লিখবে তাই আপনি প্রমাণ হিসাবে লিখে ফেলবেন? সিধে উত্তর—যে বৈধ বই গ্রন্থাগারে থাকার অধিকারী, ভারতের বাজারে বিক্রয় হয়, ছাপা হয়, তার লেখক হয়ত দরিদ্র কিম্বা ধনী, হিন্দু কিম্বা মুসলমান, গভীর শিক্ষিত কিম্বা অল্প শিক্ষিত তাহলে সেই বই হতে প্রমাণ তুলে তা লেখার অধিকার প্রত্যেকের আছে বলে মনে করি, যতদিন পর্যন্ত সেই বই বাজেয়াপ্ত না হয়।

আসল কথায় আসা যাক্, রাবণ রাম অপেক্ষা নিকৃষ্ট নন বরং উৎকৃষ্ট অথবা সমতুল্য। প্রমাণের জন্য উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ "সে রাবণ, রামায়ণ পড়ে দেখ, রামচন্দ্রের দেশের চেয়ে সভ্যতায় বড় বৈ কম নয়। লঙ্কার সভ্যতা অযোধ্যার চেয়ে বেশি ছিল বরং কম তো নয়ই।" বইটির নাম 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' লেখকের নাম স্বামী বিবেকানন্দ, পৃষ্ঠা ১১৩। বিবেকানন্দ কি একথা বলেন নি, "স্মৃতি পুরাণাদি সামান্য বুদ্ধি মানুষের রচনা; ভ্রম, প্রমাদ, ভেদবুদ্ধি ও দ্বেষবুদ্ধিতে পরিপূর্ণ। তাহার যেটুকু উদার ও প্রীতিপূর্ণ তাহাই গ্রাহ্য অপরাংশ ত্যাজ্য।" দ্রষ্টব্য স্বামী বিবেকানন্দ 'পত্রাবলী' ৩য় ভাগ,৭৪ পৃষ্ঠা [কোঃ প্রঃ পত্রিকার সৌজন্যে, ৭ম বর্ষ, ১১সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৯২]।

ভারতের পূর্বাবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে ঐ বইয়ে আমাকে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করতে হয়েছিল—[ক] এক একটি ব্রাহ্মণের ত্রিশটি পর্যন্ত স্ত্রী থাকতো, [খ] কুলীন ব্রাহ্মণরা জীবনধারণ বা অর্থোপার্জনের জন্য বহু বিবাহ করতেন, [গ] কুলীন ব্রাহ্মণরা বৃদ্ধ বয়সে বিয়ে করতেন, এমনও হোত স্ত্রীদের সঙ্গে ৩/৪ বছর পরে পরে একবার হয়ত সাক্ষাত হোত, [ঘ] কোন ব্রাহ্মণ এক দিনেই ৪টিও বিয়ে করেছেন, [ঙ] এমনও হয়েছে যে, একই ব্যক্তি একজনের সমস্ত কুমারী কন্যাদের বিয়ে করেছেন।

এমন কথা যদি আমার লেখায় থাকে তাহলে যাঁদের মতে অন্যায় হবে তাঁদের দেখা উচিত ওগুলো লেখক মোর্তজার লেখা, না কোন উদ্ধৃতি? ক, খ, গ, ঘ, ঙ-

এর ভাবার্থ লিখলাম এবার হুবহু উদ্ধৃতি লিখছি—"কুলীন ঘরের বিবাহিতা বা কুমারী কন্যাদের খুব দুঃখের মধ্যে দিন কাটাতে হয়। কুলীনদের এই ধরণের বহু বিবাহের ফলে ব্যভিচার, গর্ভপাত, শিশুহত্যা ও বেশ্যাবৃত্তির মত জঘন্য সব অপরাধ সংঘটিত হয়।"

এবার জানাচ্ছি উপরের ক, খ, গ, ঘ, ঙ আমি পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে সংক্ষেপে লিখেছি আর এখন তা হুবহু তুলে ধরছি। ঐ সমস্ত লেখাগুলো যে বই হতে নেওয়া হয়েছে বইটির নাম 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর'। আর লেখক ভারত সরকার কর্তৃক পুরস্কার ও পদকপ্রাপ্ত, বহু স্কুল কলেজের পাঠ্য ইতিহাস লেখক ডক্টর শ্রী বিনয় ঘোষ।

হজরত মুহাম্মাদ [সঃ] জানিয়ে গেছেন তাঁর পরে যদি কেউ নবী হতেন তাহলে হজরত উমারই নবী হতেন; সুতরাং উমার একজন নবীর পছন্দমত যোগ্য মানুষ। তাই বলে তাঁকে কেউ পুরোপুরি জানতে চাইলে একথা কি গোপন করা ঠিক হবে যে, তিনি সাহাবী হওয়ার পূর্বে গুণ্ডার মত উগ্র ও বর্বর চরিত্রের ছিলেন। জানিনা আমরা মনের দিক থেকে এত মরেছি কিভাবে? হজরত মুহাম্মাদ সম্বন্ধে কি বলতেই হবে যে তিনি মাত্র একটিই বিয়ে করেছিলেন? বরং আমরা বুক ফুলিয়ে বলতে চাই তাঁর বহু স্ত্রী ছিল। এইবার যদি প্রশ্ন আসে কেন ছিল? তার উত্তর স্বতন্ত্র। উত্তরে প্রমাণ হয়ে যাবে তিনি ছিলেন নির্মল চরিত্রের শ্রেষ্ঠতম নবী। কিন্তু সত্য কথা হজম করার মন ও মস্তিষ্ক নষ্ট হয়ে গেলে তা হবে মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ!

ভারত আজ যতটুকু সভ্য তাতে সে ইউরোপীয় সভ্যতার কাছে ঋণী। ঠিক তেমনি আবার ইউরোপকে সভ্য করেছে মুসলমান জাতি। তারা যে দেশ দখল করেছে তাকে ধ্বংস করেনি, জোর করে মুসলমানও করে নেয়নি বরং সেখানকার দখল করা জায়গা এক এক টুকরো সেই দেশের নেতাদের হাতে দিয়েই তাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। এখন যদি বলা হয়, এত বড় কথা? আমরা ইউরোপের কাছে ঋণী আর ইউরোপ মুসলমান সভ্যতার কাছে ঋণী, সুতরাং মুসলমানরা ইউরোপ ও ভারতের মহাজন বা ঋণদাতা? যেমন করেই অর্থ করুন সত্যকে শেষ করে দেওয়া যায় না।

"এদিকে মূর নামক মুসলমান জতি স্পান [Spain] দেশে অতি সুসভ্য রাজ্য স্থাপন করলে, নানা বিদ্যার চর্চা করলে ইউরোপে প্রথম ইউনিভারসিটি হ'ল। ইতালি, ফ্রান্স, সুদূর ইংল্যাণ্ড হতে বিদ্যা শিখতে এল; রাজা রাজড়ার ছেলেরা যুদ্ধবিদ্যা আচার কায়দা সভ্যতা শিখতে এল। বাড়ি ঘরদোর সব নতুন ঢঙে বনতে লাগলো।" এই উক্তি আমার নয়। এটিও স্বামী বিবেকানন্দের নিজেরই লেখা, কোন অনুবাদ নয়। দ্রষ্টব্য 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' পুস্তকের পৃষ্ঠা ১১০।

ভারত হতে সাম্প্রদায়িকতা যাতে চিরতরে বিলুপ্ত হয়, ভারতের প্রত্যেক মানুষ যেন মিলেমিশে পরস্পর একে অপরকে ভাই বলে মনে করতে পারে, সাম্প্রদায়িক

দাঙ্গা যাতে আর না হয়—এই উদ্দেশ্যেই 'ইতিহাসের ইতিহাস' লিখেছিলাম।

"১৯৪৬ এর ভয়ানক রক্তাক্ত দাঙ্গা কলকাতাতেও হয়েছিল....বেলেঘাটা, ইন্টালি, কড়েয়া, বেনেপুকুর, তালতলা, ওয়াটগঞ্জ, একবালপুর এলাকায় হত্যা, লুঠ, আর জ্বালানো হয়েছে মুসলমানের সর্বস্ব। পুলিশের সহযোগিতায় এই হত্যাকাণ্ড হয়েছে। তার জন্য দায়ী গুণ্ডা? না, তা নয়। প্রকৃতপক্ষে দায়ী মিথ্যা ইতিহাস আর বিষাক্ত লেখক শ্রেণী।"

এই কথাটুকু যদি সাধারণ মানুষকে দেখানো হয় তো মনে হবে লেখক শুধু অত্যাচারিত মুসলমানরা কেমনভাবে অত্যাচারী হিন্দুর দ্বারা কষ্ট পেয়েছে তাই লিখেছেন। এটা লেখার কী দরকার? যদি লিখলেন তো মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ কি লেখার মত ছিল না? ৮৩ পৃষ্ঠায় ঐ কথা আছে, অবশ্য ওটা পশ্চিমবাংলার পত্রিকা হতেই নেওয়া। ঠিক ৮৪পৃষ্ঠায় খোঁজ করলে এ লেখা কি পাওয়া যাবে না যে, "ঠিক তেমনি পূর্ব বাংলায় [বর্তমানে বাংলাদেশ] ও পাকিস্তানে যেভাবে হিন্দুদের হত্যা করা হয়েছিল তা বাঘ সিংহের হিংস্রতাকে অতিক্রম করেছিল। যার জন্য সেখানকার মুসলমান বংশধরকে বহু যুগ পর্যন্ত নির্লজ্জজনক ঘৃণিত অপরাধের ধিক্কার বহন করতে হচ্ছে এবং হবেও।" এইবার চিন্তা করুন আমার নিরপেক্ষতার ত্রুটি কতটুকু?

আরও লিখেছি, যা ৮৫ পৃষ্ঠায় তাকালেই মিলবে—"কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য দায়ী মুসলমানগণ এবং ভারতে দায়ী হবেন হিন্দুগণ। অবশ্য একথা স্বীকার করতে হবে যে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ও শান্তিপ্রিয় নিরপেক্ষ মানুষ আজও আছেন, পূর্বেও ছিলেন এবং আগামীতেও থাকবেন। যে খৃষ্টানেরা [ইংরেজ] আমাদের ভেদবুদ্ধি শিক্ষার গুরু তাদের মধ্যেও সাধু সজ্জন মানুষ, নিরপেক্ষ মানুষ নেই বললে শুধু অপরাধই হবে না বরং সত্যের অপলাপ করা হবে।"

ডক্টর দীনেশচন্দ্রের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করেছি রামায়ণ মহাভারতের মত মহান গ্রন্থগুলো সর্বপ্রথম অনুবাদ করিয়েছিলেন রাজা হুসেন শাহ, পরগাল খাঁ এবং ছুটি খাঁ। আবার একথাও লিখতে ভুলে যাইনি যে, বাংলা ভাষায় যিনি প্রথমদিকে কোরআনের অনুবাদ পেশ করেন তিনি হচ্ছেন বাবু গিরিশচন্দ্র সেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অবদানের পাশেই মুসলমান কবি নজরুলের অবদানের কথাও আছে। সংগ্রামী বাদল, বিনয়, দীনেশের পাশে ওলিউল্লাহ, শহীদ ইসমাইল, আজিমুল্লাহ, উবাইদুল্লাহ, হুসাইন আহমাদ [রঃ] এঁর নামও লিখে গেছি। এর নাম নাকি বিশ্বাসে আঘাত দেওয়া!

সিরাজের পিছনে যেমন মুসলমান মীরজাফর ও মহম্মদী বেগ আছে তেমনি গান্ধীর পিছনে দাঁড়িয়ে আছে ঘাতক নাথুরাম। কারবালার রক্তাক্ত যুদ্ধ হয়েছে, উভয়

পক্ষই মুসলমান; কুরুপাণ্ডবের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধও হয়েছে, যেখানে উভয় পক্ষই হিন্দু [দ্রষ্টব্য ৮৯পৃষ্ঠা]। ওগুলো লেখার সহজ ও সোজা অর্থ ছিল সমস্ত হানাহানি ভুলে যেতে হবে। এখন মজবুত দেশগঠন ও উন্নত মানসিকতা প্রস্তুতির সময় এসেছে।

কিভাবে আমাদের হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি হোল তার গবেষণামূলক তথ্য আমি পরিবেশন করেছি ঐ গ্রন্থে। যেমন ভারতের যত খৃষ্টান আজ রয়েছেন সমীক্ষা করলে দেখা যাবে বেশির ভাগই তাঁরা অমুসলমান হতে খৃষ্টান হয়েছেন। মুসলমান থেকে খৃষ্টান হয়েছেন হাজারে একটাও নয়। এই মুসলমান জাতিকে ধ্বংস করতে হলে তাদের কোরআন ও হাদিসের উপর অবজ্ঞা ও অবহেলা জন্মিয়ে দিতে হবে। এই ছিল অভিসন্ধি। আর তার মোক্ষম অস্ত্র হচ্ছে ইতিহাসে মুসলমান রাজা বাদশাহ যাঁরা ধর্মভীরু ছিলেন তাঁদের চরিত্রে কালি লাগাতে হবে আর যাঁরা ধর্মবিমুখ তাঁদের খুব প্রশংসা করে 'হীরো' করে তুলতে হবে। সেইজন্য মৌলানা হাফেজ আলমগীরকে ইতিহাসে দুষ্ট প্রমাণ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে সুলতান মাহমুদকে লুণ্ঠনকারী, চরিত্রহীন দেখানো হয়েছে। কিন্তু ওগুলো বিকৃত ইতিহাস। বিকৃত করার কারণ তিনিও [মাহমুদ] ছিলেন একজন সুদক্ষ হাফেজ ও আলেম। মুহম্মাদ বিন তুঘলককে অত্যাচারী এবং পাগল বলা হয়েছে। আসলে তিনিও ছিলেন বড় একজন আলেম ও কোরআন কণ্ঠস্থকারী হাফেজ। এইসব চরিত্র বিকৃত করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা প্রমাণ করা যে, কোরআন হাদিস অনুযায়ী যাঁরা চলতেন তাঁরাই নাকি বেশি হিন্দু বিদ্বেষী। ফলে মুসলমান ছাত্রছাত্রী কোরআন ও ধর্মীয় জীবন থেকে দূরে থাকবে। অপরদিকে স্বেচ্ছাচারী এবং মুসলমান নামধারী নিকৃষ্ট মুসলমান রাজা বাদশাহকে প্রশংসার মুকুট পরিয়ে হীরো করা হয়েছে। যেমন আকবর ইত্যাদি। ইতিহাস কী এবং কোথা থেকে তার উৎস তা আমার ঐ বইয়ের শুরু হতেই আলোচনা আছে এবং সমস্ত বইটি ইতিহাসের অজানা অপ্রকাশ্য তথ্যসম্ভারে সাজানো।

আমরা ছেলেবেলায় স্কুলে পড়বার সময় ইতিহাসের সার কথাগুলো জেনে থাকি। তারপরে কলেজে গিয়ে সেগুলোর সমালোচনা পর্যালোচনা পেয়ে থাকি। তখন জানতে পারি ভারতীয় ইতিহাসের বড় বড় ঐতিহাসিকের নাম—রমেশ মুজমদার, যদুনাথ সরকার, কিরণ চৌধুরী, বিনয় ঘোষ, ঈশ্বরী প্রসাদ, কানুনগো, ভিন্সেন্ট স্মিথ, ফিলিপ হিট্টি, জি. সি. ওয়েলস, উইলিয়ম মূর প্রভৃতি। কিন্তু আমাদের জানা দরকার ঐসব ঐতিহাসিকগণ কোন্ বই, কাদের লেখা বই পড়ে এত বড় বড় ঐতিহাসিক হয়েছেন।

পৃথিবীর বুকে ইতিহাস শাস্ত্র একপ্রকার মুসলমানদেরই জন্ম দেওয়া বললে অত্যুক্তি হয় না। কতকগুলো নাম উল্লেখযোগ্য। একটু মন দিয়ে লক্ষ্য করুন। অন্ততঃ একবারও আপনার দ্বারা উচ্চারিত হোক্ ঐসব মহান মূল ঐতিহাসিকদের নাম—জনাব ইবনে খালদুন, জনাব আলি বিন হামিদ, জনাব উৎবী, জনাব বাইহাকী, জনাব কাজী মিনহাজুদ্দিন সিরাজ, জনাব মহীউদ্দিন, জনাব মুহাম্মদ ঘুরী, জনাব জিয়াউদ্দিন

বারনী, জনাব আমীর খুসরু, জনাব শামসী সিরাজ, জনাব বাবর, জনাব ইয়াহিয়া বিন আহমাদ, জনাব জওহর, জনাব আব্বাস শেরওয়ানি, জনাব আবুল ফজল, জনাব বাদাউনি, জনাব ফিরিস্তা, জনাব কাফি খাঁ, জনাব মীর গোলাম হুসাইন, জনাব গোলাম হুসাইন সালেমী, জনাব সাইয়েদ আলি প্রমুখ। পৃথিবীর মূল ইতিহাস বলতে প্রায় সবই মুসলমানদের লেখা এবং বেশির ভাগই আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষায়। যেমন, তাজুম্মাসির, তবকৎ-ই-নাসিরি, খাজেনুল ফতওয়া, ফতওয়ায়ে সালাতিন, কিতাবুর রাহলাব, তারিখি মুবারক শাহী, তারিখি ফিরোজ শাহী, তারিখি শের শাহী, তারিখি আকবর শাহী, মখজান এ আফগান প্রভৃতি। তাছাড়া তারিখি দাউদী, আকবর নামা, আইনি আকবারী, চাচানামা, মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ, তাবাকাত্ই আকবরী, তারিখি হিন্দুস্তান, মুনতাখাবুল লুবাব, মাসির-ই-রহিমি, শাহজাহান নামা, সফিয়াতুল আউলিয়া, ইকবাল-নামা-ই-জাহাঙ্গীরী, ফতহুল বুলদান, আনসাবুল আসরাফ ওয়া আখবারোহা, উয়ুনুল আখইয়ার, তারিখি ইয়াকুবী, তারিখি তাবারী, আখবারুর রসুল ওয়াল মুল্ক, আখাবারুজ্জামান, মারওয়াজুজ জাহাব, তামবিহুল আশরাফ, উসদুল গাবাহ, আখবারুল আব্বাস, কিতাবুল ফিদ-আ, মুয়াজ্জামুল বুলদান প্রভৃতি বইগুলো ভারত তথা পৃথিবীর ইতিহাস সম্ভার। এইগুলোই মূল ইতিহাস। 'ইতিহাসের ইতিহাসে' ওগুলো প্রত্যেকটি কার লেখা কত সালে প্রকাশিত এবং ইতিহাসের কোন্‌দিক সম্বন্ধে কোন্ বই-এ আলোচনা আছে তা যথাসম্ভব লেখা হয়েছে। এই সকল মূল গ্রন্থগুলো ইংরেজরা অনেক পরিশ্রম করে তাতে ইচ্ছামত ভেজাল বা বিষ মিশ্রিত করে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। আর তার থেকেই আমাদের বাংলাদেশের তথা ভারতের ঐতিহাসিকগণ ঐতিহাসিক হতে পেরেছেন। সত্যি কথা বলতে গেলে আরবী ফারসী বা উর্দু না জেনে শুধু ইংরেজি পড়ে ঐতিহাসিক হওয়া যায় না। যেহেতু মূল ইতিহাস পড়তে হলে মূলগ্রন্থের পাঠোদ্ধার করতে হয় যেগুলোর অধিকাংশই আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে লেখা। আপনার আমার পরিচিত নামকরা ডক্টর উপাধি পাওয়া ক'জন ঐতিহাসিক ইতিহাসের মূল ভাষা জানেন? শতকরা একজনও আছেন কিনা সন্দেহ।

ইতিহাসে ভেজাল দেওয়া কিভাবে হয় তার এ- নমুনা দেখুন। যেমন আমি লিখলাম, 'হিন্দু জাতি ও ধর্মের নিন্দা করিও না, করিলে সে আমার বন্ধু বলে গণ্য নয়।' বাক্যটিতে মাত্র ২৯ টি অক্ষর আছে। ঐ ২৯ টি অক্ষর এবং শব্দগুলো বজায় রেখেও কেউ বাক্যের অর্থ উল্টে দিতে পারেন। এবার দেখুন, 'হিন্দু জাতি ও ধর্মের নিন্দা করিও, না করিলে সে আমার বন্ধু বলে গণ্য নয়।' অর্থ একেবারে বিপরীত। শুধু একটি কমা [,] দ্বারা লেখকের উদ্দেশ্য বানচাল করা যায়। যেমন করে 'ইতিহাসের ইতিহাস'কে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে বেহিসাব বিকৃতি ঘটানো হয়েছে। আমরা সরকার নিয়ন্ত্রিত ইতিহাসে ইংরেজের আমলেও আওরঙ্গজেবকে যেভাবে জানতাম ভারত স্বাধীন হয়েও আওরঙ্গজেবকে সেই আসামী রূপেই পাচ্ছি ঃ [১] তিনি গোঁড়া

মুসলমান [২] হিন্দু বিদ্বেষী [৩] ভাইদের হত্যাকারী [৪] বৃদ্ধ পিতাকে বন্দীকারী [৫] হিন্দুদের কাছ থেকে জিজিয়া কর আদায়কারী [৬] হিন্দুদের মন্দির অপবিত্র ও ধ্বংসকারী ইত্যাদি।

এর উত্তরে 'ইতিহাসের ইতিহাসে' ১৮১ পৃষ্ঠায় যা বলেছি তাতে প্রমাণ হয়েছে তিনি শুধু নির্দোষীই নন, মহাগুণী উদার এবং 'মহামতি' উপাধি পাবার অধিকারী। সংক্ষেপে জানাই যে তিনি কোরআন কণ্ঠস্থকারী হাফেজ, মাওলানা ও বুজর্গ বা সে যুগের জিন্দাপীর ছিলেন। প্রায় সমস্ত ইতিহাসে লেখা আছে —"তিনি বর্ণে বর্ণে কোরআন মেনে চলতেন"। যদি ঐতিহাসিকদের কথা সত্য হয় তাহলে কোরআন বিরোধী কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নিশ্চয় হয়নি। তাহলে জোরালো কণ্ঠে বলা যায় কোরআন হাদিসে গোঁড়ামী এবং অন্যায়ের স্থান নেই। আগেই বলেছি বেশির ভাগ লোক যাঁকে গোঁড়া হিন্দু ও গোঁড়া মুসলমান বলেন তাঁরা ভুল বলেন। যিনি নিজ ধর্ম পালনে আগ্রহী তিনি নিষ্ঠাবান, গোঁড়া নন। কোরআনের ত্রিশ অধ্যায়ে অমুসলমানদের জন্য বলা আছে, "তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম, আমার জন্য আমার ধর্ম", কোন বিরোধের কথা নেই। আবার কোরআনের তৃতীয় অধ্যায়ে আছে —"ধর্মে জবরদস্তি করা নিষিদ্ধ"। তাছাড়া হজরত মুহাম্মাদ [সঃ] বলেছেন, "যে মানুষের উপর দয়া করেনা, আল্লাহ তার প্রতি করুণা করেন না।" আসলে নকল ঐতিহাসিকরা বিদেশিদের অনুগ্রহে যা পেয়েছেন তাই পরিবেশন করেছেন।

এবার দ্বিতীয় নম্বরের উত্তর উচ্ছে—পিতা মাতাকে তিরস্কার, অবজ্ঞা অথবা অহঙ্কার প্রকাশের উদ্দেশ্যে 'উঃ' পর্যন্ত বলতে দেওয়া কোরআনে নিষেধ। সেখানে কঠোরভাবে বলা আছে—মা ও বাবার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার তো দূরের কথা খারাপ বাক্য পর্যন্ত না বলে শিষ্টবাক্যে কথা বল। তাহলে আওরঙ্গজেবের পক্ষে ঐসব অন্যায় কি করে করা সম্ভব হয়েছিল? তৃতীয় নম্বরের উত্তর—ভাইদের হত্যা করা তো দূরের কথা কোন মানুষকে বিনা কারণে হত্যা করলে তাকে প্রাণদণ্ড নিতে হবে এবং কোরআনে আছে অনেক শাস্তিসহ চিরদিন তাকে নরকে থাকতে হবে। অতএব কী করে তা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল? সুতরাং এ কথাও সত্য নয়। চতুর্থ নম্বরের উত্তর—জিজিয়া তিনি নিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তা হিন্দুদের উপর অত্যাচার না অনুগ্রহ, সেটাই বিচার্য। পঞ্চম নম্বরের উত্তর—একটু আগেই আলোচনা হল এ অধিকার ইসলাম ধর্মে নেই। এবারে সহজেই প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে তাহলে কি সব মিথ্যা? তিনি কাউকে বিশ্বাস করতেন না—এও একটা অভিযোগ। তাহলে তিনি অবিভক্ত বিশাল ভারতবর্ষ পঞ্চাশ বছর পরিচালনা করলেন সব একাই? যখন ট্রেন, বাস, টেলি যোগাযোগ, বেতার, বিমান কিছুই ছিল না তখন এত বড় বিশাল দেশ হাতের মুঠোয় রেখে পঞ্চাশ বছর কাটিয়ে বার্ধক্যপ্রাপ্ত হয়ে আকস্মিক নয়, রাজনৈতিক কারণে নয়, সাধারণভাবে পরলোকগমন করেন। এটা একটা অলৌকিক ক্ষমতা অথবা অসাধারণ যোগ্যতার সাক্ষী বহন করছে কিনা তা বিবেচনার বিষয়।

এক হাতে তলওয়ার অন্য হাতে কোরআন, হয় মুসলমান হও নতুবা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও, এটা ইসলাম ধর্মে আছে বলে যাঁরা লিখেছেন এবং শেখাচ্ছেন তাঁরা সত্যবাদী নন। যদি মেনেই নেওয়া যায় ইসলাম ধর্মে তাই আছে, আর আলমগীর বা আওরঙ্গজেব কোরআন বর্ণে বর্ণে মানতেন তাহলে পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করার পর ইসলামী প্রশাসনে ভারতে একটিও হিন্দু থাকা সম্ভব ছিল কি? যে কোন নিরক্ষর মানুষকে প্রশ্ন করলেও এর উত্তর মিলবে। বাবরের শাসনকাল থেকে আজ পর্যন্ত ভারতের ইতিহাসে কখন কোন্ বছরে মুসলমানদের অত্যাচারে হিন্দুর সংখ্যা কমে গিয়েছিল আর মুসলমানের সংখ্যা বেশি হয়েছিল? মনে রাখা উচিত, আওরঙ্গজেবের প্রধান সেনাপতি হিন্দু ছিলেন। তাছাড়া বড় বড় সেনাপতি যাঁদের হাতের ইঙ্গিতে হাজার হাজার সৈন্য প্রাণ দেবার জন্য প্রস্তুত থাকতো তাঁরা কি অমুসলমান ছিলেন না? যেমন শ্রী আর্জুজী, শ্রীঅচলাজী, শ্রীভিমসিংহ, শ্রীজয়সিংহ এবং শ্রীযশোবন্ত সিংহ। এঁরা কি হিন্দু ছিলেন না?

মন্দির ভাঙ্গা যদি ইসলামী নীতি হয় আর তিনি যদি ইসলামের কথা বর্ণে বর্ণে মেনে চলার লোক হন তাহলে ভারতে একটি মন্দিরেরও অস্তিত্ব থাকা কি সম্ভব ছিল? আজও যাঁরা কুয়োর ব্যাঙ নন্ তাঁরা জানেন বহু প্রাচীন মন্দির আছে যেগুলো আওরঙ্গজেবের জন্মের পূর্ব হতে সাক্ষী হিসাবে দণ্ডায়মান। ১৯৪৬ সালেও আমাদের বঙ্গদেশের পাঠ্যপুস্তক 'ইতিহাস পরিচয়' বইয়ে ছাত্র ছাত্রীদের যা পড়ানো হয়েছে তা হোল, "জোর করিয়া মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদ নিমার্ণের উদ্দেশ্যই যদি আওরঙ্গজেবের থাকিত তবে ভারতে কোন হিন্দু মন্দির থাকিত না। সেইরূপ করা তো দূরের কথা বরং বেনারস, কাশ্মীর ও অন্যান্য স্থানের বহু মন্দির, তৎসংলগ্ন বহু দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি আওরঙ্গজেব নিজের হাতে দান করিয়া গিয়াছেন। সে সকল 'সনদ' আজ পর্যন্ত বিদ্যমান।" [দ্রষ্টব্য ১৩৮ পৃষ্ঠা]

যশোবন্তসিংহ তাঁর সেনাপতি হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর পক্ষে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করলেন এবং পরাজিত হয়ে বন্দী হলেন। তারপর ক্ষমা চাইলেন তিনি। প্রাণদণ্ড না দিয়ে আওরঙ্গজেব তাঁকে ক্ষমা তো করলেনই উপরন্তু তাঁকে সেনাপতিই বহাল রাখলেন। ঐ বিশ্বাসঘাতকতা একবার নয় বার বার করেছেন তিনি, আর প্রত্যেকবার ক্ষমা করেছেন আলমগীর। যশোবন্তের বিশ্বাসঘাতকরার ঘটনা স্যার যদুনাথ সরকারও স্বীকার করেছেন তাঁর History of Aurangjeb বই এর ৫০৫ পৃষ্ঠায় — "Of all the actors in the drama of the war of Succession, Jasâwant emerges from it with the worst repuation : he had run away from a fight where he commanded in chief, ... unhappy was the man who put faith in Jasawant Singh, lord of Marwar and Chieftain of the Rathor clan."

শিবাজীকেও তিনি বারবার ক্ষমা করেছিলেন, তাঁর পুত্র শম্ভাজীকেও অনেকদিন বন্দী করে রেখেছিলেন কিন্তু কই জোর করে তাঁকে মুসলমান করার চেষ্টা করেন নি

তো? তাঁরা মুক্তি পেয়ে নিজের জাতি ও ধর্ম নিয়েই ফিরে গিয়েছেন। বর্তমান পৃথিবীর কোন বন্দী যদি দাবী করে যে, এক একটি ঝুড়িতে চল্লিশ পঞ্চাশ কিলো করে মিষ্টি পাঠাবেন তার গুরুর গৃহে, তা হবে হাস্যাস্পদ আর হবে কড়া চাবুক খাবার রাস্তা চওড়া করা। কিন্তু শিবাজীর ঐ রকম ইচ্ছায় আওরঙ্গজেব সে অনুমতিও দিয়েছিলেন। তাই মিষ্টির ঝুড়িতে পিতাপুত্রের পলায়ন সম্ভব হয়েছিল। নিশ্চয় ঝুড়িগুলো দু-এক কিলোর ঝুড়ি ছিল না। তবুও ইংরেজের লেখা ইতিহাস আজও বিষ ছড়াচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের কচি কচি মগজে। ভ্রাতৃ হত্যার অভিযোগও সাজানো গোছানো। ইসলামী রাষ্ট্রে বিচারের ভার থাকে মুফতী ও কাজির উপর। দারার প্রাণদণ্ড হয়েছিল আদালতে, 'মোরতাদ' ও অন্য অপরাধের কারণে; আলমগীরের বিচারে নয়। সুজার মৃত্যু দিল্লীতেই হয়নি। যখন তিনি সপরিবারে আরাকানে গিয়েছিলেন সেই সময় পরিবারের গহনা ও মূল্যবান সম্পদের আশায় দুষ্কৃতিদের হাতে সপরিবারে নিহত হয়েছিলেন। মোটকথা সেখান থেকেই নিখোঁজ হয়েছিলেন। এটা দিল্লির ব্যাপারই নয়।

মুরাদের বন্দী হওয়ার পূর্ব হতেই সম্ভ্রান্ত নাগরিক আলী নকী খাঁকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্য তিনি অপরাধী ছিলেন। বিচার শেষে প্রাণদণ্ড হয়—আওরঙ্গজেবের বিচারে নয়, বিচারকের দরবারে। অথচ ইতিহাসের নামে কতই প্রহসন!

কোন পুত্র পিতার মঙ্গলের জন্য তাঁকে বাইরে যেতে দেননি এমন ঘটনা আমাদের দেশেও ঘটে, যখন দেখা যায় পিতা অসুস্থ অথবা খুব বৃদ্ধ অথবা বিকৃত মস্তিষ্ক। বিশ্বসুন্দরী মমতাজের মৃত্যুর পর শাহজাহানের মস্তিষ্ক বিকৃতি, বিবেচনা ক্ষমতা লোপ, বার্ধক্যহেতু অসুস্থতা প্রভৃতি সবগুলো কারণই ছিল। যাকে বন্দী করা হয় তাকে কষ্ট দেবার জন্যই তা করা হয়, আদর ও সেবা করার জন্য নয়। কিন্তু আওরঙ্গজেব পিতাকে রাজপ্রাসাদে রাখতেন, নিজে পদসেবা করতেন। যেদিন নিজে পারতেন না, তাঁর বোন জাহানারা তাঁকে দেখাশোনা করতেন। আত্মীয়স্বজন সকলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারতেন এবং প্রয়োজনে শিশুর মতই আলমগীর পিতার সঙ্গে পরামর্শ করতেন।

পিতা শাহজাহান যদি স্বাধীন থাকতেন তাহলে আর একটি কালো পাথরের 'তাজমহল' করার কল্পনা তাঁর ছিল। ফলে রাজকোষ খতম হোত এবং রাজ্য অন্য ছেলের হাতে চলে যেত। ঐতিহাসিক ডক্টর শ্রীবিনয় ঘোষ একাদশ শ্রেণীর পাঠ্য ইতিহাসেও দারার জন্য লিখেছেন, "পিতার স্নেহের ছায়ায় মানুষ হইয়া তিনি যুদ্ধ বিগ্রহ ও রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে প্রায় অনভিজ্ঞ ছিলেন।" তিনি আরও লিখেছেন," আওরঙ্গজেবের চরিত্র ইহার ঠিক বিপরীত।" মিঃ ঘোষ মুরাদের জন্য লিখেছেন, "কোন দিক দিয়া তিনি আওরঙ্গজেবের সমকক্ষ ছিলেন না।" সুজার জন্যও তিনি লিখেছেন, "তিনি অত্যন্ত আমোদপ্রিয় [বিলাসী] ছিলেন এবং মদ্যপানের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি তাঁহার অনেক সদগুণ নষ্ট করিয়াছিল।" সুতরাং দেশের কল্যাণে

ভারতের কল্যাণে পিতাকে রাজনীতির চিন্তা হতে নিষ্কৃতি দানের নামই 'বন্দী' নামের প্রহসন।

আলোচনা দীর্ঘ না করে সংক্ষেপে বলা যায় মুহম্মাদ বিন তুঘলক এবং সুলতান মাহমুদের চরিত্রও এইভাবে কলঙ্কিত করা হয়েছে যা মোটেই সঠিক নয়। ইংরেজের কাছে তাঁদের অপরাধ ছিল, তাঁরাও হাফেজ ও উলামা দলের মানুষ ছিলেন। অতএব প্রমাণ করতে সুবিধা হয়েছে, ইসলাম ধর্ম মানেই হিন্দু বিদ্বেষ, মন্দির ভাঙ্গা, ধর্মান্তর ইত্যাদি। সুতরাং এক ঢিলে দুই পাখি মারা হয়েছে—হিন্দু বুঝবেন মুসলমান তাঁদের শত্রু আর বুদ্ধিজীবী মুসলমানও স্কুল কলেজ ইউনিভারসিটিতে কোরআন হাদিস পড়ার সুযোগ না পেয়ে শুধু ডিগ্রী আর এই বিষাক্ত অনুভূতি নিয়ে বের হবেন যে, ইসলাম ধর্ম মানেই হয়ত পরধর্ম বিদ্বেষ, ধর্মান্তর, নারীলোলুপতা, বিলাসপরায়ণতা। অথচ অন্যদিকে আকবরকে এত বড় করে দেখানো হয়েছে যার অনেক কিছুই অলীক আর অতিরঞ্জিত।

অনেকে অবাক হয়ে ভবতে পারেন তাহলে আকবর কি 'মহামতি' উপাধি পাওয়ার উপযুক্ত নন? এর উত্তরে বলতে চাই, প্রথমে আপনার আশেপাশে একটি তের বছরের ছেলে খোঁজ করুন, যে মোটেই লেখাপড়া জানে না। তাকে সামনে বসিয়ে নিজের বিবেককে জিজ্ঞাসা করুন আগামীকাল তাকে সারা ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সম্রাট অথবা প্রধানমন্ত্রী করে দিলে তার পক্ষে চালিয়ে নেওয়া সম্ভব কিনা? যদি সম্ভব না হয় তাহলে আসুন চিন্তা করি, আকবর যেদিন সিংহাসনে বসেন সেদিন ছিল ১৫৫৬ সালেব ৪ঠা জানুয়ারি, তখন কি তাঁর বয়স তের বছর ছিল না? ইতিহাসের পাতায় তিনি কি নিরক্ষর ছিলেন না? তাহলে তিনি 'মহামতি' উপাধি নিয়ে সুদীর্ঘকাল সুশাসন করে ১৬০৫ সালে মারা যান অর্থাৎ ৪৯ বছর শাসন করেন—এটা কি চিন্তার বিষয় নয়? কে পিছন থেকে তাঁকে পুতুলের মত সিংহাসনে বসিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন? তিনি কি বৈরাম খাঁ নন? তাঁর নামে জয়ঢাক বাজানো হয়নি কেন? আসলে তিনি ধর্মভীরু মুসলমান ছিলেন, তাই এই চক্রান্ত!

অবশ্য একথা ঠিক যে, আকবরের চরিত্র যাই হোক তাঁর শাসনপ্রণালী ছিল উন্নত শ্রেণীর। আবার একথাও ঠিক যে, তাঁর এবং শেরশাহের শাসনপ্রণালী ছিল প্রায় একই রকম। যদি তাই হয়, তাহলে কার শাসন আগে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? শেরশাহ আগের মানুষ, আকবর পরের মানুষ। স্বভাবতই আকবর অনুসরণ করেছেন শেরশাহকে। সুতরাং 'মহামতি' উপাধি দেওয়া তো উচিত ছিল শেরশাহকে। কিন্তু বেচারা ছিলেন ধর্মভীরু, তাই তিনিও বঞ্চিত।

আওরঙ্গজেবকে নিন্দা করার পিছনে কোরআন ও হাদিসের নিন্দা করার বিষাক্ত ইচ্ছা ছিল কিছু ইরেজ ঐতিহাসিকদের। তাই জিজিয়া কর নিয়ে এত হৈচৈ! কাগজে লেখা হয়েছে হিন্দুদের উপর অত্যাচার করবার জন্য জিজিয়া করের প্রবর্তন করা হয়। যেহেতু ঐ কর শুধু হিন্দুদের দিতে হোত, মুসলমানদের দিতে হোত না। আমরাও

সরকারি ইতিহাস পড়ে জিজিয়া সম্বন্ধে যা বোঝার তাই বুঝেছিলাম, কিন্তু বেসরকারি মূল ইতিহাসে যে সমস্ত তথ্য পেয়েছি তাতে যে কোন শিক্ষিত উদার পাঠকের ভাবান্তর হতে বাধ্য।

আওরঙ্গজেব সিংহাসনে বসে মুসলমান ও অমুসলমানদের উপর যত রকমের মনগড়া প্রচলিত ট্যাক্স বা কর ছিল তা আস্তে আস্তে তুলে দিলেন। মোট আশি প্রকার কর তুলে দিলেন। ফলে সব শ্রেণীর মানুষ স্বাভাবিকভাবে খুশি হলেন। কিন্তু মুসলমানদের জন্য কতকগুলো কর থেকেই গেল, যেমন জাকাত, ওশর, ফেতরা, খুমুস, ফিদিয়া, বকরীদ-কর ইত্যাদি। এগুলো কোন হিন্দুকে দিতে হোত না। এমতাবস্থায় যদি হিন্দুদের কোন করই না দিতে হোত তাহলে সেটা নাগরিক জীবনের গৌরব হোত না, বরং তা অগৌরবেরই হোত।

মুসলমান ছাড়া অমুসলমানদের 'জিম্মি' বলা হোত এবং তাদের কাছ থেকে জিজিয়া নেওয়া হোত। আর প্রত্যেক মুসলমানই ইসলামী আইনে রাষ্ট্রীয় সৈনিক। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সক্ষম মুসলমান নাগরিককে দেশরক্ষায় নামতে বাধ্য থাকতেই হয়। অমুসলমানদের উপরও যদি ঐ আইন প্রয়োগ করা হোত তাহলে আরো হৈচৈ হোত। তাই তাদের কোন যুদ্ধে নাম দেওয়ার বাধ্যবাধকতা ছিল না। শুধু জিজিয়া দিলেই মুসলমানদের মত তাঁরাও হতেন সমান মর্যাদার নাগরিক।

এখানে আর একটা কথা প্রমাণ করা যেতে পারতো যে, হিন্দুদের বিশ্বাস করা হোত না—এটাই তার প্রমাণ। কিন্তু মজার কথা হচ্ছে, এই জিজিয়ার পিছনে এত উদারতা ছিল যে অমুসলমান সৈন্য যখন যুদ্ধে যোগ দিতেন তাঁকে সম্মানের সঙ্গে নেওয়া তো হোতই এমনকি জিজিয়া করটুকু তাঁকে দিতে হোত না। এখানে প্রমাণ হয়—মুসলমান শাসকরা চাইতেন যাতে অমুসলমানগণ প্রশাসন বা সৈন্যবাহিনীতে দলে দলে নাম লেখান। অমুসলমানদের মধ্যে যাঁদেরকে জিজিয়া দিতে হোত না এবং কেন দিতে হোত না সেটুকু যদি ইতিহাসে জানানো হোত তাহলে আওরঙ্গজেব আর ইসলামকে ঘৃণ্য মনে হোত না।

কোন মহিলা, বালক-বালিকা, বৃদ্ধ, বিকলাঙ্গ, অন্ধ, বোবা, পুরোহিত, সন্ন্যাসী, ভিক্ষুক এবং সামরিক বিভাগের ছোট বড় কোন কর্মচারিকেই জিজিয়া দিতে হোত না। সুতরাং সূর্যের আলোর মত পরিষ্কার প্রমাণ হচ্ছে ঐ জিজিয়া মাথা গুনতি কর ছিল না, বরং তা সামরিক কর ছিল।

আওরঙ্গজেব বহুপ্রকার কর তুলে দিয়েছিলেন একথা স্যার যদুনাথ সরকার তাঁর Mughal Administration গ্রন্থে স্বীকার করেছেন। তিনি এও জানিয়েছেন যে, ঐ সমস্ত কর হতে বাৎসরিক পাঁচ কোটি টাকা আয় হোত। বছরে পাঁচ কোটি টাকার কর সেই বাজারে তুলে দেওয়া চিন্তার বিষয় নয় কি? ঐতিহাসিকদের অনেকে ৮০টি করের বিলোপ সাধনেব কথা জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, যখন তিনি ৮০টি করের

বিলোপ সাধন করলেন তখন প্রশংসা পাননি কিন্তু শুধু একটি করের [জিজিয়া] জন্য চারিদিকে এত কলরব ধ্বনি। 'Vindication of Aowrangzeb' গ্রন্থে আছে, "When Aowrangzeb abolished eighty taxes no one thanked his generosity. But when he imposed only one, at not heavy at all, people began to show their displeasure."

ডঃ জে. কে. কান্তি লিখেছেন, অমুসলমানগণ অত্যন্ত শান্তি ও সম্মতিতে জিজিয়া দান করতেন, যেহেতু তাঁরা বুঝেছিলেন মুসলমান শাসক ন্যায় ও সত্যের দৃঢ় প্রতিষ্ঠাতা এবং বিচারের সময় তারা পক্ষপাতশূন্যভাবে ন্যায় বিচার করে। এই তথ্য তিনি আরও বিশদভাবে লিখেছেন তাঁর 'স্পেনের ইতিহাস' পুস্তকে।

ভারতের পরলোকগত কংগ্রেস নেতা মহপণ্ডিত মাওলানা আবুল কালাম আজাদ লিখেছেন, "পৃথিবীর সমস্ত ইতিহাস পড়াশুনার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ভারতের হিন্দু জনসাধারণ অনেকে জিজিয়া করকে বিরাট ভুল বুঝেছেন, আসলে এটা আসল তথ্যের অজ্ঞতা।" [দ্রষ্টব্য 'সুলতানাতে দেহলিমেঁ গায়ের মুসলিম' গ্রন্থের ৬৮ পৃষ্ঠা]

হজরত মহাম্মদের [সঃ] জন্ম নেওয়ার পূর্ব হতেই এই জিজিয়া ছিল। বহু পূর্ব হতে বহু দেশে নানা ভাষায় জিজিয়া করের উল্লেখ আছে।

কনৌজের গহরাওয়ার বংশে জিজিয়া ছিল, সে দেশের ভাষায় তার নাম ছিল 'তুরশকি জনডা' [দ্রষ্টব্য Medieval Hindu India III, P. 211]। ভারতে ইসলাম ধর্ম প্রবেশের পূর্বে রাজপুতদের মধ্যে জিজিয়া ছিল; দেশীয় ভাষায় তার নাম ছিল ফীক্‌স [দ্রষ্টব্য Early History of India by Mr. V. Smith]। ডঃ ত্রিপাঠির মতে ফ্রান্সে যে জিজিয়া ছিল তার নাম ছিল Host Tax, জার্মানীর জিজিয়ার নাম ছিল Commonpiny, আর ইংল্যান্ডের জিজিয়ার নাম ছিল Scontage [দ্রষ্টব্য মিঃ ত্রিপাঠির লেখা Some Aspects of Muslim Administration]।

এইভাবে যদি ইংরেজদের চক্রান্ত মার্কা অভিযোগগুলো জ্ঞানের কষ্টিপাথরে যাচাই করা হয় তাহলে দেখা যাবে তাদের হীরক নামের যুক্তিগুলো কোনটিই হীরা নয় বরং বিষাক্ত কাঁচের টুকরো।

অত্যন্ত সংক্ষেপে আওরঙ্গজেবের কথা বলে আকবরের কথাও কিঞ্চিৎ বলা দরকার। প্রথমেই বলা আছে আকবরকে আলেম সমাজ নাকি খুব মন্দ মনে করেন। এক কলমেই প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে, উদার ও 'মহামতি' উপাধিপ্রাপ্ত এই মুসলমানকে উলামা সমাজ শ্রদ্ধা করতে পারেন নি; সুতরাং উলামা সমাজ উদার নন। আর এটাও অনুমান করা সহজ যে কোরআন হাদিস পড়লেই নাকি তাঁর আর উদার থাকার উপায় নেই। একজন উদার চরিত্রবান সহিষ্ণু বিচক্ষণ 'মহামতি'কে উলামা সমাজ গ্রহণ করতে না পারলে নিশ্চয়ই তা অপরাধ। কিন্তু সত্য তথ্যভিত্তিক আলোচনা সমালোচনা ও পর্যালোচনা করে ভারতের জনসাধারণকে কি সত্যটুকু জানানো হয়েছে?

আকবর একটি নতুন ধর্ম প্রচার করেছিলেন যেটির নাম 'দ্বীনিইলাহি'। এই নতুন ধর্মটি উদার ও উত্তম এইজন্য যে, আকবর সব ধর্মের সার হতেই নাকি ওটা তৈরি করেছিলেন। কিন্তু অষ্টধাতুর ঐ মাদুলিতে যে কী ছিল তা সহজে আমাদের জানতে দেওয়া হয় না।

[১] 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' ইসলামের এই মূল মন্ত্রের পরিবর্তে 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু আকবর খালিফাতুল্লাহ' চালু করতে মনস্থ করা, [২] সুদ ও মদকে হালাল বা বৈধ বলে গণ্য করা, [৩] জুয়া খেলা বৈধ হওয়া, [৪] দাড়ি রাখা অবৈধ ঘোষণা করা, [৫] যৌন সংসর্গান্তে অবশ্য-স্নানের পরিবর্তে পূর্বাহ্নে স্নানের আইন করে শরিয়ত প্রথা বাতিল করা, [৬] দু'চার দিনের জন্য অস্থায়ী বিবাহ করা এবং তালাক দেওয়া, [৭] মেয়েদের মাথায় কাপড় না দেওয়া এবং পর্দাপ্রথার বিলোপ করা, [৮] মুসলমান বালকদের খতনা বন্ধ করা, [৯] মৃতদেহকে পানিতে নিমজ্জিত করা অথবা কবর দিতে হলে পা দুটি কাবা বা পশ্চিমদিকে করে দেওয়া, [১০] পুরুষদের জন্য রেশমী পোষাক বৈধ করা, [১১] কুকুর ও শূকরের মাংস বৈধ বা হালাল করা, [১২] কোরআন মিথ্যা বলে প্রচার করা, [১৩] ঈদুল আজহায় গরু ব্যবহার বন্ধ করা, [১৪] কিয়ামত ও পরকাল প্রভৃতিতে বিশ্বাস করতে নিষেধ করা, [১৫] রাজদরবারে সাজদা বা প্রণিপাত বৈধ করে আসসালামু আলাইকুম বলা বন্ধ করা, [১৬] হিজরী সন ব্যবহার বন্ধ করে নতুন সাল চালু করা, [১৭] অসংখ্য মসজিদকে ক্লাব ও সরকারি গুদাম ঘরে পরিণত করা, [১৮] মাদ্রাসা শিক্ষা ও মসজিদে উচ্চস্বরে আজান বন্ধ করা ইত্যাদি ছিল তাঁর সৃষ্ট ঐ ধর্মের মূল কর্মসূচী। তাঁর সাধের 'দ্বীনি ইলাহি' ধর্মের ছায়ায় তিনি মোট বিবাহ করেছেন পাঁচ হাজার স্ত্রীকে। অবশ্য কেউ কেউ এই সংখ্যাতে কিছু কম বেশি করেছেন। মোট কথা পাঁচশত স্ত্রীর সংখ্যা অপেক্ষা কম স্ত্রীর কথা কেউই বলেন নি।

যে সমস্ত মূল্যবান গ্রন্থ থেকে এই সব তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে সেগুলো সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা বর্তমান ভারতবর্ষের 'স্বীকৃত' মহামান্য ঐতিহাসিকগণের বেশির ভাগই পড়তে সক্ষম নন। যেহেতু এগুলো অধিকাংশই আরবী, ফারসী প্রভৃতি বিদেশি ভাষায় লেখা।

যাঁরা ইংরাজি হরফ ছাড়া শক্তি ও শান্তি পাননা তাঁদের জন্য আকবর তথ্য জানাতে ইংরাজি উদ্ধৃতি তুলে ধরা হচ্ছে :

"The Emperor [Akbar] had ceased to believe in the Quran, he did not believe in life after death, nor in the Day of Judgement. He had gone further. He had determined publicly to use the new formula : 'there is no god but Allah and Akbar is God's Representative'. But as this led to commotions, he thought it wiser to restrict the use of this formula to a few people within the precincts of the Haram. Sajdah or the form of

prostration reserved by Islam for God alone, was made compulsory before the Emperor.

Wine was declared lawful, and bacon was made an ingredient of wine; Jizyah or the military tax was abolished and beef was declared unlawful. Pigs and dogs were specially reared and regarded as manifestations of God. The Salat or the prescribed prayers, the Saum or the prescribed fasts and the Hajj or pilgrimage to Mecca were abolished. The Islamic calender was replaced by the new-fangled Ilahi months and years. Indeed Islam after a thousand years was considered to have played itself out; the study of Arabic was looked upon as if it were something unlawful; the Law of Islam or Fiqh, Tafsir or the exegesis of the Quran and Hadith or the traditions of the Prophet were ridiculed; and those who prosecuted these studies were looked down as deserving of contempt.

The 'Adhan' or call to the prayers, and the Namaz-I-Jamat or congregational prayers which used to be, as prescribed by Islam, offered five times a day in the state hall were stopped. Such names as Ahmad, Muhammad and Mustafa, the various names of the Prophet of God, had become offensive to the Emperor, and to utter them was a crime. Mosques and prayer rooms were changed into store-rooms and into Hindu guard-rooms.

Islam was in great distress. Unbelievers could openly ridicule and condemn Islam and the Muslims. The rites of Hinduism were clebrated in every street and corner, while Muslims were not permitted to carry out the injunctions of Islam. The Hindus when they observed fast could compel the Muslims not to eat and drink in public, while they themselves could eat and drink publicly during Ramajan. At several places Muslims had to pay with their lives for sacrificing the cow on 'Id-ul-Adha'. A number of mosques were destroyed by Hindus and temples erected in their place." [Mujaddid's Conception of Tawhid, P. 12-14, II edition, 1943]

এই সমস্ত সত্য দুর্লভ তথ্য তথ্যানুসন্ধিৎসুদের জানানো কি অপরাধ? আমি কিন্তু ধন্যবাদ দিই তাঁদের যাঁরা সরকারকে দিয়ে ছলে-বলে-কৌশলে বইটিকে বন্ধ করালেন। তাঁদের রাজনীতিরই জয় হয়েছে। একটা মোটা গ্রন্থের কিছু জায়গা হতে কুকৌশলে পরিবর্জিত, পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে সাময়িক ভুল বোঝানো যায় কিন্তু তা চিরদিন স্থায়ী হয় না। ঠিক এমনিভাবে বক্তৃতা টেপ করে

শোনবার সময় সেই বক্তৃতার মাঝেও অনেক জালিয়াতি করা যায়। যেমন, যদি কেউ বলেন, "বর্তমান সরকার বেইমান সরকার, সাম্প্রদায়িক সরকার, মিথ্যাবাদী সরকার, মূর্খ সরকার, আমি তা অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করি না। তাছাড়া জনসাধারণ তা মেনে নেবে না। অবশ্য অনেকে বিরুদ্ধ মত পোষণ করবেন, কিন্তু মুখে বলে দিলেই হবে না, তার প্রকৃত প্রমাণ চাই। সুতরাং ঐ রকম কথা বলা অন্যায়।" এখন 'বর্তমান' হতে 'বিশ্বাস করি' পর্যন্ত যদি শোনানো হয় আর বাকী অংশে হাততালি বা কাশির শব্দ যোগ দেওয়া হয় তাহলে মনে হবে বক্তা একেবারে সরকার বিরোধী লোক। কিন্তু 'বর্তমান' হতে 'অন্যায়' পর্যন্ত যখন পুরো কথাটা কেউ শুনবেন তখন মনে হবে ঘটনা বিপরীত। এখানে বক্তব্য হোল, কোন সরকারকে কোন গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত করতে হলে খুব বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

'বহ্নিবার্তা' ও 'বসিরহাট হিতৈষী' প্রভৃতি কাগজে কিভাবে উদ্ধৃতির বিকৃতি ঘটানো হয়েছে তা দেখলে অবাক হতে হয়। কাগজ যেভাবে বিধানসভাকে প্রতারণা করেছে তাতে তাঁরা শাস্তির যোগ্য বলে অনেকে মনে করেন।

আমি নাকি 'ইতিহাসের ইতিহাসে' লিখেছি, "মুসলমান শুধু সর্বভারতীয় জাতি নয় বরং সর্ব জাগতিক জাতি আর স্বাধীনতার সমস্ত সংগ্রাম তাদেরই অবদান প্রায়। অতএব এদের বাদ দিয়ে স্বাধীনতা আনা যায় না, আর যদিও ভবিষ্যতে স্বাধীনতা আসে তাহলে মুসলমান জাতিই হবে তার জনক।"

আমি জানিয়ে দিচ্ছি 'মুসলমান শুধু' শব্দের পূর্বে আরও তিনটি শব্দ বিয়োগ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে, 'তিনিই উপলব্ধি করেছিলেন'। ঐ 'তিনিই'টি কে? 'তিনি' ব্যবহার করা হয়েছে স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর জন্য। এক্ষেত্রে তাঁর দূরদৃষ্টির প্রশংসা করা হয়েছে। ঐ কথা আমার পক্ষ হতে লেখা নয়, স্যার সুরেন্দ্রনাথের পক্ষ হতে লেখা। তাঁরই উক্তি —"The progress of India does not mean the progress of the Hindus alone, it means the advancement of Hindus and Mohammadans alike. It means Hindus and Mohammadans must march hand in hand." দ্রষ্টব্য Speech of Surendranath Banerjee পুস্তকের পৃষ্ঠা ৯৫, লেখক R.J.Mitra।

পৃথিবীতে বহু জাতি আছে যাদের একটি দেশেই সীমাবদ্ধ দেখা যায়, আবার কোন কোন জাতি একাধিক রাষ্ট্রে প্রসারিত। কিন্তু এমন দু'চারটি জাতি আছে যারা পৃথিবীর সর্বত্র বিদ্যমান, যেমন খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি। সুতরাং মুসলমান জাগতিক জাতি—কথাটা এত অপ্রিয় হল মহাপণ্ডিতদের কাছে?

স্বাধীনতার ইতিহাসে বর্তমানে উন্নতির উচ্চাসনে যাঁদের দেখা যায় অর্থাৎ প্রত্যক্ষ সংগ্রামী হিসাবে যাঁদের সবচেয়ে বেশি অবদান বলে শেখানো হয় তাঁরা হচ্ছেন গান্ধীজী, জহরলাল, মতিলাল, প্যাটেল প্রভৃতি। আর কলমে যাঁরা স্বাধীনতা এনেছেন বলে শেখানো হয় তাঁরা হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম, নবীনচন্দ্র প্রমুখ মনীষীবৃন্দ। এখন

এঁদের বিরুদ্ধে কোন সত্য তথ্যবহুল গ্রন্থ যদি কেউ লিখে থাকেন এবং আজ পর্যন্ত যদি তা ভারতীয় লাইব্রেরিগুলোতে জমা থাকে তাহলে এখনো উপায় আছে—তাড়াতাড়ি ওগুলো আগুনে পুড়িয়ে ফেলাই উচিত।

সরকারি তরফ থেকে যদি একটা সুযোগ করে দেওয়া হয় যে, আনন্দবাজার, যুগান্তর, আজকাল, বসুমতী, বর্তমান প্রভৃতি বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকাগুলোতে নেগেটিভ পজেটিভ দুরকমই দলিল প্রকাশ করা হবে; সেজন্য একটি পৃষ্ঠা শুধু সংরক্ষিত থাকবে এক বছরের জন্য। অথবা সরকার যদি ঐ দলিল চেয়ে পাঠান তাহলে লেখার বন্যা বয়ে যাবে। তাতে কিন্তু সরকারি ইতিহাস পচা মাছের মত ঘৃণ্য হয়ে উঠবে বলে অনেকের বিশ্বাস। অবশ্য যদি সরকার সেগুলো বই আকারে বা পত্রিকাকারে প্রকাশ করার প্রতিশ্রুতি দেন। 'ইতিহাসের ইতিহাসে' যদি প্রমাণ হয়েই থাকে যে, আজকে যাঁরা স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা তাঁরা বেশিরভাগই ছিলেন স্বাধীনতা বিরোধী, তাঁরা যেটি চেয়েছিলেন সেটি হচ্ছে 'স্বরাজ'—একথা লেখা ও বলা দুই-ই অন্যায়, অন্ততঃ অহিন্দু লেখকের ক্ষেত্রে। কিন্তু অমুসলমান লেখকের লেখা হলে তা বোধ হয় দোষের নয়, হয়ত সেই বই বাজেয়াপ্ত করার দরকার হবে না। তবে বাজেয়াপ্ত করা বা করানোর একেবারে মূলে যাঁরা সুইচ টিপছেন, তাঁদের মনে রাখা উচিত 'ইতিহাসের ইতিহাসে' প্রত্যেক বিষয়, প্রত্যেক পাতা, প্রত্যেক তথ্য প্রমাণ করার জন্য শুধু মুসলমান নয় বরং নিরপেক্ষ অমুসলমান লেখকের লেখাও আমাদের পক্ষে পেশ করা বেশি কঠিন হবেনা।

১৭৫৭ তে সিরাজের বিপর্যয় পর্বের পর হতেই মুসলমানেরা বারে বারে দলে দলে নানাভাবে স্বাধীনতার জন্য মাথা তুলেছেন, লড়াই করেছেন কিন্তু ইংরেজের কঠিন শক্তিতে তাঁদের পতন হয়েছে। তারপর ১৭৬৫ সালে হয় 'ফকির বিদ্রোহ' [উলামা বিপ্লব]। ১৮৬৪ সালে আম্বালা ষড়যন্ত্রের মামলায় মুসলমানদের সশস্ত্র সংগ্রামের পরিসমাপ্তি হয়, তার পূর্বেই ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে মাওলানা সৈয়দ আহমাদ ব্রেলবী ও মাওলানা ইসমাইল প্রভৃতি স্বাধীনতাকামী মুসলিম নেতারা অনেকেই শহীদ হন।

এদিকে ঐ ১৮৩১ সনেই সৈয়দ নিসারের [তিতু] 'বাঁশের কেল্লায়'ও হাজার হাজার মুসলমান বিপ্লবী শহীদ হন। ১৮৪৭ হতে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত মুসলমানদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে 'ওহাবী আন্দোলন' নাম দেওয়া হয়েছে। এই ওহাবী আন্দোলন ইংরেজদের পক্ষে যে কী মারাত্মক হয়েছিল তা জানবার জন্য মুসলমান বিরোধী হলেও মিঃ উইলিয়ম হান্টারের 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস্' গ্রন্থ যথেষ্ট। এবার আর একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

"১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ওয়াহাবি আন্দোলন এক নতুন রূপ ধারণ করে। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ হতেই ওয়াহাবিরা শিখেদের বিরুদ্ধে জেহাদ পরিহার করে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে তখন থেকেই হিন্দুরা এই আন্দোলনের

প্রতি সহানুভূতি দেখায়। লক্ষণীয় এই যে এমন দক্ষতার সঙ্গে এই আন্দোলন পরিচালিত হয় যে ওয়াহাবিদের উদ্দেশ্য ইংরেজ বিতাড়ন করে মুসলিম শাসন পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা হলেও কোথাও ওয়াহাবিদের সাথে হিন্দুদের সংঘর্ষ হয় নি। হিন্দুরা সম্প্রদায়গতভাবে এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ না করলেও তাঁদের সহানুভূতি প্রদর্শন বৃটিশ সরকারকে উদ্বিগ্ন করে তোলে।"

এই উদ্ধৃতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ শ্রী অমলেন্দু দে'র 'বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ' গ্রন্থের ১৩০ পৃষ্ঠা হতে নেওয়া। অতএব প্রমাণ হচ্ছে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম প্রথমের দিকে, ১৭৫৭'র পর হতে অন্ততঃ ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মুখ্যতঃ মুসলমানেরাই করেছিলেন তারপর হিন্দু সম্প্রদায় বিপ্লবে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ না করলেও শুধু সমর্থন করতে শুরু করেন। কিন্তু যখন চতুর ইংরেজ শিখদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়েছিল তখন কিন্তু মুসলমানদের প্রতি হিন্দুজনগণ আশানুরূপ সহানুভূতি দেখায় নি।

পরে ডঃ অমলেন্দুবাবু আরও লিখেছেন, "মনে রাখা প্রয়োজন, ওয়াহাবিরাই সর্বপ্রথম বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সঙ্ঘবদ্ধভাবে ভারতবর্ষ হতে ইংরেজ বিতাড়নের জন্য দীর্ঘকালব্যাপী এক সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়। আর এই ওয়াহাবি আন্দোলনকে মুসলিম কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার অভিপ্রায়ে মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত ভারতবর্ষে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে উল্লেখ করা যায়।"

অধ্যাপক অমলেন্দুবাবু যে সমস্ত বই হতে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাতে কয়েকশত বই এর নাম লেখা রয়েছে। উপরোক্ত তথ্যটি প্রমাণের জন্য ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের British Paramountcy and Indian Renaissance, Vol IX, part-I এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনকেই ইংরেজ নাম দিয়েছে 'সিপাহী বিদ্রোহ', 'ওহাবী আন্দোলন' প্রভৃতি। আজও পাঠশালা হতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত 'সিপাহী বিদ্রোহ' কথাটি ঘুচলো না। তাই ওহাবী আন্দোলন না বলে আমি 'মুসলমান আন্দোলন', 'মুসলিম বিপ্লবী' শব্দ ব্যবহার করছি।

[ক] ঐ মুসলমান আন্দোলনে জঙ্গিপুরে জঙ্গি মনোভাব প্রদর্শনের ফলে মুর্শিদাবাদের অনেক মুসলমান সরকারি কর্মীদের বাছাই করে করে পদচ্যুত করা হয়। ১৮৫৭ সালে ১০ই মার্চ বহরমপুরে তাঁদের বিপ্লবকে কঠিন হস্তে দমন করা হয়। আজ সেই মুর্শিদাবাদের মুসলমানদের পুরস্কারের পরিবর্তে নিষ্ঠুর ইতিহাসে তিরস্কার দেওয়া হয়েছে—তাঁরা নাকি 'মীরজাফরের জাত' ইত্যাদি।

[খ] একদল স্থায়ী মুসলমান বিপ্লবী দল ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে সফর করে বেড়ায়। এই দল পরিচালনার জন্য জেলা কমিটি ও কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। বাংলাদেশ থেকে মুসলমান বিপ্লবীদের প্রধান কেন্দ্র সীতানায় দুরন্ত দু'হাজার মাইল

হলেও এক চমৎকার গুপ্ত সংগঠন মারফত সব কাজ সুসম্পন্ন হোত। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অর্থ ও সভ্য সংগ্রহ করে সীতানায় প্রেরণ করা হোত। এতই সুচারুরূপে ও গোপনীয়তা অবলম্বন করে মুসলিম বিপ্লবী ও সংগঠন পরিচালিত হোত যে বৃটিশ সরকার অনেক চেষ্টা করেও তাঁদের বিষয়ে কোন সংবাদ গ্রহণ করতে পারে নি। সীতানা শিবিরে তাঁদের যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হোত।.....এই দলের সভ্যরা এক ধরণের 'গুপ্তভাষা' ব্যবহার করতো। সুতরাং এক সুশৃঙ্খল কাঠামো তৈরি করে এই দলকে পরিচালনা করা হয়। প্রথম তথ্যটি অধ্যাপক দে'র 'বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ' হতে নেওয়া। তিনি তথ্যটি নিয়েছেন Proceeding of the Judicial Department, O.C. No 25, 29.5.1843, p. 460-61 হতে। দ্বিতীয় তথ্যটি মূলতঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের পূর্বোক্ত পুস্তক হতে নেওয়া হয়েছে।

"১৮৫২ খৃষ্টাব্দে [বিপ্লবী মাওলানা] বেলায়েত আলির মৃত্যুর পর [মাওলানা] এনায়েত আলি মুসলিম বিপ্লবীদের অবিসংবাদী নেতা নিযুক্ত হন এবং তাঁর পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে সচেষ্ট হন। এই সময় মুসলিম বিপ্লবীরা বাংলাদেশের ও বিহারের বিভিন্ন জেলায় মীরাট, বেরেলী ও দিল্লীতে খুবই সক্রিয় হয়। পাটনা কেন্দ্রের মুসলিম বিপ্লবীরা প্রকাশ্যে বিদ্রোহবার্তা প্রচার করে পাটনার বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা [মাওলানা] আহমাদুল্লার নেতৃত্বে সাতশত সশস্ত্র বিপ্লবী ম্যাজিষ্ট্রেটকে যে কোন তদন্তে বাধা দেবার জন্য প্রস্তুত হয়। এমনকি পুলিশের মধ্যেও বিপ্লবীদের সংযোগ স্থাপিত হয়। তাছাড়া ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যেও বিদ্রোহের প্রচার চলে।" এইভাবে সারা ভারতে সৈন্যদের ক্ষেপিয়ে তোলা হয়। "১৮৫৩ সালে ইংরেজের সাথে ভীষণ যুদ্ধ হয় তাতে বিখ্যাত বীর নেতা করম আলী শহীদ হন।" তাছাড়া আরও অনেকেই শহীদ হন এবং কারাবরণ করেন।

"১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে মহাবিদ্রোহের সূচনা হয়।" ঐ সময় মাওলানা আহমাদুল্লাহ বন্দী হন এবং নেতা মহম্মদ হোসেনও বন্দী হন। মুসলমান বিপ্লবীদের কেন্দ্র সীতানা ধ্বংস করবার জন্য "১৮৫০ খৃষ্টাব্দ হতে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বৃটিশ সরকার মুসলিম বিদ্রোহীদের ও তাঁদের সহযোগীদের ধ্বংস করবার জন্য প্রায় ষোলটি অভিযান প্রেরণ করে। তবুও বৃটিশ সরকার সফল হয়নি। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে স্যার সিডনি কটন পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে মুসলমান বিপ্লবীদের আক্রমণ করেন......।"

বার বার হানা দিয়ে বিদ্রোহ দমন করা হয় এবং বিপ্লবীদের সীতানা কেন্দ্র ইংরেজ দখল করতে সক্ষম হয়। মনে রাখার কথা হচ্ছে এই, ইংরেজ হচ্ছে সরকার আর বিপ্লবীরা হচ্ছে ছোটখাট অস্ত্রে সজ্জিত সাধারণ মুসলমান। "১৮৬৩ খৃষ্টাদে জুলাই মাসে মুসলমান বিপ্লবীরা তাঁদের পুরাতন প্রধান কর্মস্থল সীতানা পুনরায় [ইংরেজের হাত হতে] দখল করতে সমর্থ হয়।" এই উদ্ধৃতিগুলোও অমলেন্দু দে লিখিত পূর্বোক্ত পুস্তক হতে নেওয়া।

মণি বাগচি, অমলেন্দু দে, সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র,

রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ মনীষীবৃন্দ যেখান থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন সেগুলো লাইব্রেরির মহামূল্য সংরক্ষিত কপি ও দলিলাদি। ঐ দলিল ও বই হতে যখন আমি লিখলাম তখনই বই বাজেয়াপ্ত! তাহলে কি ভারতে মুসলমান হয়ে জন্মগ্রহণ করাটাই অপরাধ? যার জন্য আমার উদার দৃষ্টিভঙ্গির হিন্দু মুসলমানের মিলন মৈত্রীর সেতুর মত 'ইতিহাসের ইতিহাস'কে নির্দোষ প্রমাণ করবার জন্য হিন্দু লেখক ভাইদের উদ্ধৃতির গঙ্গাজল ছিটিয়ে শুদ্ধ হতে হবে? যদি তাই হয়, তাহলে তাই করা যাক।

ঐ বই হতে আরও উদ্ধৃতি দিতে বাধ্য হচ্ছি যেহেতু সৌভাগ্যক্রমে লেখক আমার এক ভাগ্যবান হিন্দু ভাই। "অনেক মুসলমান বিপ্লবীকে বন্দী করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে পরপর কয়েকটি রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা দায়ের করা হয়, যথা—আম্বালা মামলা ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ, পাটনা মামলা ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ, মালদহ মামলা ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ এবং ওহাবী মামলা ১৮৭০-১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ। তাদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল তারা বৃটিশ শাসনকে উচ্ছেদ করবার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং বৃটিশ সম্রাজ্ঞীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে।" ঐ সময় বিপ্লবী মাওলানা আহমাদুল্লার জমি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং বহু বিপ্লবীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। মালদহের মওলুবী আমিরুদ্দিনের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। বর্তমান ইতিহাসে তাঁদের নামগন্ধ পর্যন্ত নেই। মাওলানা আমিরুদ্দিনের পিতা "বৃদ্ধ রসিক মণ্ডল গর্বিতভাবে পুত্রকে হৃদয়ের সমস্ত উত্তাপ দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে বলেন— তিনি তাঁর পুত্রকে হারাতে প্রস্তুত আছেন।"

এখনকার কারাদণ্ড মানে কয়েক বছর পর বাড়ি ফিরে আসা, তখন ছিল চিরদিনের মত কারারুদ্ধ, যা ফাঁসির চেয়েও ছিল অসহনীয়। মালদহ, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর এই পাঁচ জেলার প্রধান হয়ে যিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন ইব্রাহিম মণ্ডল। ঐ বিপ্লবী ইব্রাহিমকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়ে অবশ্য তাঁকে ১৮৭৮ সালে মুক্তি দেওয়া হয়। তার প্রধান কারণ "[মাওলানা] ইব্রাহিম মণ্ডল সততা ও ধর্মপরায়ণতার জন্য এই অঞ্চলে এতই সম্মানিত ছিলেন যে সরকারের পক্ষে তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষী গ্রহণ করা কষ্টকর হয়।"

কলকাতার কলুটোলায় মুসলমান চামড়া ব্যবসায়ীদের ঐ বিপ্লবে মোটামোটা অর্থ সাহায্য করার অপরাধে কেস হয়। পাঁচজনের যাবজ্জীবন জেল হয়। তার মধ্যে ৭৫ বছরের বৃদ্ধ আমীর খাঁনকে নির্বাসন না দিয়ে কলকাতার জেলে বন্দী করে রাখা হয় এবং ১৮৭৯তে মুক্তি দেওয়া হয়। দু'মাসের মধ্যেই তিনি প্রাণত্যাগ করেন। জেলের প্রহারই তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। [তথ্য ঃ অমলেন্দু দে, পূর্বোক্ত পুস্তক]

১৮৭১ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর বিপ্লবী আব্দুল্লাহ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মিঃ নরমানকে খতম করেন। পরে প্রাণদণ্ড ছাড়া আর কি পাবার ছিল? ১৮৭২ সালে শের আলী লর্ড মেয়োকে খতম করেন। মাওলানা কেরামত আলী ৪০ বছর নৌকা করে বিভিন্ন নদীপথে ঘুরে বেড়ান—"তাঁর ঐ নৌকা ছিল যেন ভাসমান কলেজ।"

১৮৭৩ সালে ৩০শে মে রংপুরে তাঁর মৃত্যু হয়।

আরও দু'একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি তা নাহলে হয়তো শুদ্ধ হতে পারবো না। ফয়জাবাদের মাওলানা আহমাদুল্লার মাথা এনে দিতে পারলে ইংরেজ বহু মূল্যের পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। "অবশেষে জুন মাসের প্রথমভাগে পোয়াইনের রাজা জগন্নাথ সিংহের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ইংরেজের মহাত্রাস এই মৌলবীর মৃত্যু হয়। গভর্ণমেন্ট সেই সময় এই বিদ্রোহীর মাথার দাম ধার্য করেছিলেন পঞ্চাশ হাজার টাকা। বিশ্বাসঘাতক রাজা মৌলবীর ছিন্ন মস্তকের বিনিময়ে শাহজাহানপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে এই পুরস্কার লাভ করেছিলেন। ফয়জাবাদের মৌলবী আহমাদুল্লার মৃত্যু হলো। তাঁর বীরত্ব ও স্বদেশ প্রেমের প্রশংসা ইংরেজ ঐতিহাসিকরা পর্যন্ত [যেমন মেলিসন] করেছেন, ...স্যার কলিনের ন্যায় বীর পুরুষকেও তাঁর সমর-চাতুরীর প্রশংসা করতে হয়েছিল।"

এই উদ্ধৃতি শ্রী মণি বাগচীর 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' গ্রন্থের ৩৩৮ পৃষ্ঠায় আছে। বইটির প্রথম প্রকাশ ১৯৫৭ সালে। এত কথা লিখছি কেন? সেই ছোট্ট কথাটির জন্য, যাঁরা কাগজে লিখে মন্ত্রীদের মগজে বিষ ঢেলেছেন "........ স্বাধীনতার সমস্ত সংগ্রাম তাঁদেরই অবদান প্রায়।"

১৮৭৩ পর্যন্ত আলোচনা হোল। এখনো কিন্তু জহরলালের জন্মই হয়নি যেহেতু জহরলাল জন্মেছিলেন ১৮৮৯ সালে। জন্মেই তো আর রাজনীতি করেন নি। বড় হয়েছেন, বিলেত গিয়ে ব্যারিস্টার হয়েছেন মানেই ১৯০০ সালের আগে রাজনীতির মধ্যে তাঁর কোন অবদানই নেই। গান্ধীজীর জন্মও ১৮৬৯ সালে। তিনিও বিলেত গেছেন, ব্যারিস্টার হয়েছেন মানেই সেই ১৯০০ খৃষ্টাব্দেরও পর তাঁর নেতৃত্বের জন্ম। সর্দার প্যাটেলের ১৮৭৫তে জন্ম। তিনিও বড় হয়েছেন, বিলেত গেছেন ব্যারিস্টার হয়েছেন অর্থাৎ সেই ১৯০০ খৃষ্টাব্দের পরে তাঁরও নেতৃত্বের জন্ম।

রবীন্দ্রনাথও জন্মগ্রহণ করেন উনবিংশ শতাব্দীতে, মৃত্যু ১৯৪১ সালে। বঙ্কিমচন্দ্র জন্মান ১৮৩৮এ, মৃত্যু হয় ১৮৯৪এ। সিপাহী বিপ্লবের সময় তিনি ১৯ বছরের কিশোর মাত্র। তাহলে দেখা যাচ্ছে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম দিকে আজকের ইতিহাসের বিখ্যাত নেতাদের হয় জন্মই হয়নি অথবা শিশু ও বালক ছিলেন বা কাজের উপযুক্ত হননি অনেকে।

এবার যদি কেউ বলেন, বিশেষ করে মুসলমান লেখক যদি লিখে ফেলেন, গান্ধীজী, জহরলাল, প্যাটেল প্রভৃতি নেতাগণ ঠিক স্বাধীনতা চাননি, চেয়েছিলেন 'স্বরাজ' অর্থাৎ খানিকটা অধিকার, আর মুসলমান নেতারা বা 'খেলাফত কমিটি' চেয়েছিলেন স্বাধীনতা অর্থাৎ ইংরেজ চলে যাক ইংল্যান্ডে, ভারতবাসীই ভারত চালাবে—তাহলে তো বোধ হয় হতভাগ্য মুসলমান লেখকের আর রক্ষাই নেই!

ভারতে কংগ্রেসের জন্ম হয় ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে। আর এই ভারতেই ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে

মুসলিম লীগের জন্ম হয়। সুতরাং এই কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ স্বাধীনতার জন্মদাতা হবে কী করে? অবশ্য এরা দেশ বিভাগের জন্মদাতা, হিন্দু মুসলমানের রক্তারক্তির জন্মদাতা বললে তার প্রত্যুত্তরে কোন দলিল দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই।

মুসলমানদের 'খেলাফত কমিটি' চেয়েছিল বিদেশী ইংরেজ বা খৃষ্টান বিতাড়ন আর কংগ্রেস চেয়েছিল ইংরেজের অধীনে স্বায়ত্বশাসন।

করাচীতে কংগ্রেসের অধিবেশনে একজন কংগ্রেস নেতা কংগ্রেসের পক্ষ হতে স্বাধীনতার দাবী জানান। শ্রদ্ধেয় হিন্দু নেতা 'লালা লাজপত রায় তাঁর পুরো হিন্দু ডেলিগেটদের নিয়ে' তার বিরোধিতা করেন। যিনি স্বাধীনতার দাবী করেছিলেন তিনি একজন হতভাগ্য মুসলমান, নাম মাওলানা হসরত মোহানি [তথ্যঃ 'ভুলে যাওয়া ইতিহাস', পৃষ্ঠা ১০৩]। জহরলালকে দিয়ে কলকাতার মিটিংয়ে স্বাধীনতার কথা উচ্চারণ করানো হয় কিন্তু তাঁর কথা শেষ হতে না হতে তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা কংগ্রেস নেতা মতিলাল নেহেরু তাঁকে থামতে বলেন এবং বসিয়ে দেন। [ঐ পুস্তক, পৃষ্ঠা ১০৩]

মাওলানা মুহাম্মদ আলী পরিষ্কারভাবে সদর্পে 'স্বাধীনতা চাই, স্বরাজ নয় বলে বক্তৃতা দিয়ে জনগণকে আকৃষ্ট করেন। মনে রাখার কথা, ১৯২২ সালে কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে মুসলমান নেতাদের চাপে স্বরাজের পরিবর্তে 'পূর্ণ স্বাধীনতা' স্বীকার করা হয়। ইংরেজিতে যে কথাগুলো রেজুলেশনে লেখা হয়েছিল তা গম্ভীরভাবে পড়ার বিষয়—"The best interest of India and the Moslems demand that in the Congress creed the term 'Swaraj' be substituted henceforth by the term 'Complete Independence'. অর্থাৎ ভারতের এবং কংগ্রেসের মুসলমানদের দাবীর কারণে 'স্বরাজ' শব্দটির পরিবর্তে 'সম্পূর্ণ স্বাধীনতা'র প্রস্তাব গৃহীত হোল।

"১৯২১ সালে কংগ্রেসের আমেদাবাদ অধিবেশনে মাওলানা হসরত মোহানি পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উপস্থিত করেন। মহাত্মা গান্ধী এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ '....The demand has grived me because it shows lack of responsibility.' অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী আমাকে বেদনা দিয়াছে; কারণ প্রস্তাবটি দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক।"

মুসলিম লীগ এমনি সৃষ্টি হয়নি বরং তা সৃষ্ট হতে বাধ্য হয়েছিল কংগ্রেসের অনেক নেতাদের ভ্রান্ত পদক্ষেপে— [ক] "একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কংগ্রেসে তিলক, লাজপত রায়, অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতির নেতৃত্বে সনাতনপন্থীদের প্রতিপত্তিই মোসলেম লীগের গঠন-সম্ভাবনা সৃষ্টি করে।" [খ] "হিন্দু ও মুসলমান সম্পর্কে তিনি [মহাত্মা গান্ধী] যথাক্রমে 'আমরা' ও 'তাহারা' এই সর্বনাম ব্যবহার করিয়াছেন।"

উপরোক্ত সব উদ্ধৃতিগুলো 'পনেরোই আগষ্ট' গ্রন্থের ১০৫ হতে ১০৯ পৃষ্ঠায়

দ্রষ্টব্য। লেখক শ্রীসত্যেন সেন।

সত্যেন সেন আরও লিখেছেন, "ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের বিশ্বাসীর চক্ষে দেখিত না। রাজত্ব হারাইয়া মুসলমানগণই প্রথমে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইয়াছিল। এই সমস্ত আন্দোলনের মধ্যে ওয়াহাবী আন্দোলন উল্লেখযোগ্য। এবং প্রসঙ্গত এখানে বলা যাইতে পারে যে, মুসলমানদের আন্দোলন এবং সিপাহী বিদ্রোহের পর হইতে যে জাতীয় চেতনা সঞ্চার হইয়াছিল—তাহাকে অবলুপ্ত [ধ্বংস] করিবার জন্যই ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের মত একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিল।" [দ্রষ্টব্য পনেরোই আগষ্ট ঃ সত্যেন সেন, পৃষ্ঠা ১০২]

সরকারের আইনের প্রহসনে ১৯৩০ হতে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত জেলে যে প্রত্যক্ষ বিপ্লবী বন্দী ছিলেন সেই সত্যেন সেন স্বয়ং অরবিন্দ, লালা লাজপত, বঙ্কিম প্রভৃতি রক্ষণশীল হিন্দু নেতাদের জন্য দরদ ও দুঃখ নিয়ে লিখেছেন, "তথাপি সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিবার ফলে জাতীয় আন্দোলনের গতিধারা সম্মুখগতি অবলম্বন না করিয়া পশ্চাৎগামী হইয়া পড়িল। কারণ গোহত্যা নিবারণ, দেবদেবীর পূজা প্রভৃতি ধর্মানুষ্ঠান কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মসূচী হইলে অপরাপর ধর্ম সম্প্রদায় সেই প্রতিষ্ঠানকে প্রীতির চক্ষে দেখিবে —ইহা আশা করা যুক্তিযুক্ত নয়। বলাবাহুল্য এই গোঁড়া হিন্দু মনোভাবই শেষ পর্যন্ত মুসলমান সম্প্রদায়কে জাতীয় আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। শুধু তাহাই নহে রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন বহু হিন্দুও এই গোঁড়ামী বরদাস্ত করিতে না পারিয়া চরমপন্থীদের সংস্রব পরিত্যাগ করে.... পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু তাঁহাদের অন্যতম।"

এবার আমি অরবিন্দকে যদি মুসলমান বিদ্বেষী এবং গোঁড়া মনে করি, তাহলে তার উত্তরে বলবো, 'বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা' গ্রন্থের ২৬০ পৃষ্ঠায় সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় শত শত গ্রন্থের সাহায্যে নিয়ে কি লেখেন নি যে, "জনশক্তির বোধন ও শত্রুনিধন কল্পে বরোদায় অরবিন্দ বগলা মূর্তি গড়িয়ে পূজা করেন [১৯০৩ খৃষ্টাব্দে]। গুপ্ত সমিতিতে নবাগত কর্মীদের তিনি [অরবিন্দ] এক হাতে গীতা অপর হাতে তলোয়ার দিয়ে বিপ্লবের শপথ গ্রহণ করাতেন।" কোন মুসলমানের পক্ষে গীতা ছুঁয়ে শপথ করা আর বগলা ও কালীপূজা করা সম্ভব নয়; সুতরাং এটা মনে করা খুব সহজ যে, এই ধরণের কার্যকলাপই মুসলমানদের মুসলিম লীগে যোগ দিতে এবং তার শক্তিবৃদ্ধি করতে বাধ্য করেছিল।

আমরা যেটা 'স্বাধীনতার ইতিহাস' বলে পড়ি বা পড়াই সেটা শক্তি হস্তান্তরের ইতিহাস, ইংরেজের ভারত ত্যাগের ইতিহাস, তাদের ইচ্ছায় দেশ বণ্টন ব্যবস্থার ইতিহাস, হিন্দু মুসলমান লড়াই-এর ইতিহাস মাত্র। তাই সত্যেন সেন তাঁর পুস্তকের ৫৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "ইহা সত্ত্বেও গান্ধীজী এ. আই. সি. সি.র বোম্বাই অধিবেশনে [৭ই জুলাই] বলিয়াছেন ঃ 'ইংরাজরা ভারত ছাড়িবার জন্য নিজেরাই খুব ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের শান্তিতেই যাইতে দেওয়া উচিত, আন্দোলন করিয়া তাহাদের

যাইবার পথে বাধা সৃষ্টি করা উচিত নয়।'

নৌসেনারা যখন ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে ধর্মঘট পালন করেন তখনকার পরিস্থিতি জানিয়ে সত্যেন সেন লিখেছেন, "উপরন্তু কংগ্রেসের পক্ষ হইতে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ধর্মঘট ও হরতাল পালন না করিবার জন্য জনসাধারণের নিকট এক পাল্টা নির্দেশ জারী করেন। ইহার কারণ কি?" "সর্দার প্যাটেল এক বিবৃতিযোগে বলিলেন—নৌধর্মঘটিদের অস্ত্রধারণ উচিত হয় নাই। এমনকি তিনি নৌবাহিনীতে শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে প্রধান [ইংরেজ] সেনাপতির অভিমতকে অভ্যর্থনা জানাইলেন।"

সুভাষ বসু, চিত্তরঞ্জন দাস, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এঁরাও স্বাধীনতা চেয়েছিলেন তাই তাঁদের ঐ ইতিহাস আজও সাধারণের কাছে প্রায় অজ্ঞাত। 'ইতিহাসের ইতিহাসে' এঁদের ঐতিহাসিক মূল্যায়ন করেছি বলে ঐ বই বাজেয়াপ্ত করানো হয়েছে নানা কৌশলে। কিন্তু যাঁদের সত্য ইতিহাস লিখে গেলাম তাঁরা অনেকই কি হিন্দু নন? আসল ব্যাপার হিন্দু মুসলমান নয়, যে ইতিহাসগুলো সহজলভ্য নয়, চাপা পড়ে গেছে সেগুলো বাঁচিয়ে রাখাই ছিল ঐ বইয়ের উদ্দেশ্য। কারণ সকল মানুষের পক্ষে বড় বড় লাইব্রেরির সভ্য হয়ে বিভিন্ন শহরে বসে বসে বই পড়া সম্ভব নয়। তাছাড়া বছরের পর বছর ধরে হাজার হাজার বই পড়ার সময় হয়ে ওঠেনা। সুতরাং এমন কিছু বই থাকা দরকার যেগুলোর একটি পড়লেই শত শত বা সহস্র বই এর সন্ধান পাওয়া যাবে।

আমি 'ইতিহাসের ইতিহাসে' এমন সব তথ্য লিখেছি যেগুলো অনেকের অজানা ছিল; তাই চমকে যাবারই কথা। অনেক অজানা রাজনৈতিক তথ্য লিখেছি গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র মহাশয়ের 'অবিস্মরণীয়' গ্রন্থ হতে। তিনি জিন্নাহ, সুভাষ, জহরলাল, প্যাটেল, গান্ধীজী সম্বন্ধে যা লিখেছেন তাতে কোন দোষ যদি না হয় তাহলে মুসলমান লেখক সেগুলো লিখলে দোষের হবে কেন?

গঙ্গানারায়ণ চন্দ্রের কথাই বলি। তিনি কি প্রত্যক্ষ সংগ্রামী ছিলেন না? তাঁকে কি ইংরেজ সরকার জেলে দেননি? তিনি কি একজন উচ্চ শিক্ষিত মানুষ নন? তাঁর ঐ কিছু কম সাতশত পৃষ্ঠার বইটিতে ভারত বিখ্যাত বরণীয় মানুষেরা মন্তব্য দিলেন কেন? যেমন অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, তপতীনাথ মুখার্জী, পঞ্চানন চক্রবর্তী, শ্রীবিভূতিভূষণ সরকার প্রমুখ। পণ্ডিচেরী আশ্রম হতে কেন শ্রীঅনন্তলাল সিংহ লিখে পাঠালেন, "অবিস্মরণীয়ের গঙ্গানারায়ণ, তুমি বিভূতির বন্ধু, তুমি চাঁদ নও, চন্দ্র নও, তুমি আঁধারের আলো।"

অমৃতবাজার পত্রিকায় [24.10.64] বইটি সম্বন্ধে লেখা হয়েছিল, "Let's we forget! 'Abismaraniya' by Ganganarayan Chandra is the first volume of the early revolutionary movement in Bengal.... 'Abismaraniya'—a copy of which deserves an honoured place in

every patriotic home."

হিন্দুস্তান স্ট্যাণ্ডার্ডে কেন প্রকাশিত [27.4.64] হয়েছিল, "...His account is marvellously lively. ...He has beautifully sketched the character and achievements of many of our martyrs and freedom fighters."[

কেন আনন্দবাজার পত্রিকা ২৭শে সেপ্টেম্বর [১৯৬৪] ঐ গ্রন্থ সম্বন্ধে ২৪ লাইন প্রশংসা সম্বলিত মন্তব্য লিখলো? বসুমতীতে কেন ১৯শে আশ্বিন [১৩৭১] লেখা হোল, "বইটির নাম অবিস্মরণীয়, সত্যই অবিস্মরণীয়। .... লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।"

শুধু আমার মত দরিদ্র লেখক ঐ গ্রন্থ হতে উদ্ধৃতি বা মর্মার্থ ব্যবহার করলেই বই বাজেয়াপ্ত হবে? যুগান্তর পত্রিকায় ১৯৬৪ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর লেখা হোল বেশ বড় মন্তব্য, "বইটির বিষয়বস্তু হলো ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মদানকারী বীর বিপ্লবীদের অজ্ঞাত কীর্তিকাহিনী ....কেবল লেখনী নৈপুণ্যের জন্য নয়, ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশনায় লেখকের প্রয়াস প্রশংসনীয়।" এই গ্রন্থটিতেও তো গান্ধীজী, জহরলাল, আজাদ, জিন্নাহ, প্যাটেল প্রভৃতি নেতাদের অজানা তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। কই কোন হৈচৈ তো হয়নি?

ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, নরেন্দ্রনাথ, গোপীমোহন, সূর্য সেন, সুশীল সেন, বাদল, বিনয়, ভগত সিং প্রভৃতির নাম আমরা কমবেশি জানতে পারি। ক্ষুদিরামের ফাঁসির মত মহম্মদ আসফাকুল্লাহ খাঁনেরও ফাঁসি হয়েছিল, পীর মহম্মদেরও ফাঁসি হয়েছিল। তাঁদের নাম চাপা পড়ে গেছে বলেই আমি তাঁদের নাম তুলে ধরেছি। ভারতের স্বাধীনতার জন্য মাওলানা ইসমাঈল শহীদ হয়েছেন। তাঁর নাম অজ্ঞাত। মাওলানা আহমাদ [বেরেলী] শহীদ হয়েছেন। সে নামও চাপা পড়েছে। হাফেজ যামেন সাহেব শহীদ হয়েছেন, মহম্মদ রাইসুল্লাহ'র ফাঁসি হয়, ইকবালমন্দ, গজনফর হুসাইন, সাখাওয়াত হুসেন এবং তাফাজজল হুসেনেরও ফাঁসি হয়। এঁদের নাম ইতিহাসের পাতায় বিলুপ্ত হতে চলেছে। সেগুলো আমি লিখেছি বলে বিরাট অন্যায় হয়েছে শাসকের দরবারে? তাছাড়া আব্দুল করিম, কাজী মিঞাজান, রহিম বখশ, মাওলানা ইলাহি বখশেরও ফাঁসি হয়। পীর আলির নাম আগেই করা হয়েছে তাঁর সঙ্গে আরও একত্রিশজন মুসলমানের একই সঙ্গে ফাঁসি হয়। এমনিভাবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে একটি বিশেষ সময়ের মধ্যে মোট সাতাশহাজার মুসলমান নানাভাবে শহীদ হন বা নিহত হন। আজ হাজারে একজনের নামও ইতিহাসে নেই। এই পরিসংখ্যান ইংরেজদের রিপোর্ট থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু অইংরেজদের বই থেকে যা পাওয়া যায় তাতে শহীদের সংখ্যা আরো অনেক বেশি। বর্তমান গবেষক ও ঐতিহাসিকদের মতে শুরু হতে শেষ পর্যন্ত প্রায় পাঁচ লাখ মুসলমান শহীদ হয়েছেন।

আমি 'ইতিহাসের ইতিহাসে' শতশত বিপ্লবী ও দেশপ্রেমিকের নামে সগর্বে

প্রশংসা করেছি, যাঁদের নাম বহুল পরিচিত নয়। তাই বোধ হয় আমার এটাও একটা অপরাধ যে জহরলাল, মতিলাল, প্যাটেল, আচার্য কৃপালিনি, আবুল কালাম আজাদ, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের পাশে স্থান দিয়েছি মাওলানা মহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী, মাওলানা উবাইদুল্লাহ, মাওলানা সাব্বির আহমাদ, মাওলানা হুসাইন আহমাদ, মাওলানা রশীদ আহমাদ, হাফেজ নিসার আলী, মাওলানা এনায়েত আলী, মাওলানা বেলায়েত আলী, মাওলানা আব্দুর রহিম প্রমুখ মনীষীবৃন্দকে। যাঁরা বুকের তাজা রক্ত দিলেন তাঁদের জন্য ইতিহাসে এক কলম কালি দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোটা কি এতই অপরাধ? আজ সেই রকম সূক্ষ্মদর্শী কজন আছেন যাঁরা সহজেই অনুমান করতে পারেন যে ইতিহাসে নাম থাক বা না থাক মুসলমানদের স্বাধীনতার ইতিহাসে একটা বিরাট অবদান আছে। নইলে ভারতে বহু দল, গোষ্ঠি ও জাতি আছে যেমন শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, হরিজন প্রভৃতি কই তাদের জন্য তো জৈনস্তান, শিখস্তান, হরিজনস্তান সৃষ্টি হলো না? কিন্তু মুসলমানদের জন্য ভারতের বিরাট একটা অংশ কেটে পাকিস্তান হয়ে গেল। নিশ্চয় তার কারণ আছে; তাদের অবদানের অনুপাতে ওটা হয়েছে। আমার মতে তাতে সুখকর কিছু হয়নি—সারা ভারত এক হয়ে থাকতো, সমস্ত জাতি মিলেমিশে হাতে হাত ধরে একতাবদ্ধ হয়ে বাস করতো, তাতেই ছিল আনন্দ, গর্ব এবং স্থায়ী সুখ।

ইতিহাসে যাঁরা প্রাণ দিলেন, জেল খাটলেন সেইসব হিন্দু নেতা, লেখক ও কবিদের নাম যদি পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ইতিহাস হতে বাদ দিয়ে শুধু মুসলমান ছাড়া আর কারোর নাম না রাখা হয়, তাহলে এটা পাকিস্তান ও বাংলাদেশের পক্ষে অন্যায় এবং সাহিত্য ও ইতিহাসের উপর বর্বরোচিত অত্যাচার হবেনাকি? এমনিভাবে একই ভারতের একটি অংশ পৃথক হয়ে আজ তিন খণ্ডে খণ্ডিত হয়েছে বলে ভারতে মুসলমান নেতৃবর্গ যাঁরা ইতিহাসে স্থান পাওয়ার অধিকারী তাঁদের নাম যদি বাদ দেওয়া হয় তাহলে ঠিক ঐ রকমই অন্যায় হবে যেমন পাকিস্তান ও বাংলাদেশের জন্য হোত।

সারা পৃথিবীতে সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয় মুসলমানদের অবদান, একথা শুধু আরবী গ্রন্থেই নেই 'পৃথিবীর ইতিহাস' নামক বিরাট গ্রন্থে অধ্যাপক প্রভাতবাবুও তা লিখেছেন বা স্বীকার করেছেন।

আজ যেমন ওয়াশিংটন, লন্ডন, প্যারিস, পিকিং উল্লেখযোগ্য স্থান তেমনি এর আগে কি সারা বিশ্বের মুসলিম সভ্যতার বিকাশক্ষেত্র কর্ডোভা, টলেডো, সেভিল ও গ্রানাডা ছিল না? পৃথিবীতে ইহুদীদের দর্শনশাস্ত্র যত উন্নতই হোক না কেন বারো শতক পর্যন্ত জনাব ইবনে রুশ্‌দের দর্শন কি পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দেয়নি? খৃষ্টানরা যখন মুসলমানদের হাত হতে স্পেন দখল করে তখন টলেডোর মসজিদ সংলগ্ন বিরাট লাইব্রেরি দখল করে তাকে তারা জ্ঞানচর্চার তীর্থক্ষেত্রে কি পরিণত করেনি?

বিশ্ব থেকে শ্রেষ্ঠতম শক্তি মুসলমান শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করতে খৃষ্টানেরা ধর্মের

দোহাই দিয়ে যে যুদ্ধ করেছিল সেটাকেই ক্রুসেডের যুদ্ধ বলা যায়। সেই যুদ্ধে মুসলমানদের সৃজনী শক্তির পরিচয় কি ইংরেজরা পায়নি? পৃথিবীতে প্রথম বন্দুক তৈরি ও উন্নত ধরণের বারুদের ব্যবহার কি মুসলমানদের অবদান নয়? মিঃ মার্ক লিখিত পুস্তকে ত্রয়োদশ শতকে বারুদের কথা পাওয়া যায়। কিন্তু তার অনেক বছর আগের লেখা বই 'আল ফুরুসিয়া ওয়াল মানাসিবউল হারাবিয়া' আরবী গ্রন্থে হাসান আর-রমরাহ কি বারুদের বিষয় এবং গেরিলা যুদ্ধ ও রণকৌশলের বিষয়ের বর্ণনা দিয়ে যান নি? এইসব চাপা পড়া ইতিহাস লেখা কি এত অপরাধ? সিরিয়ার মুসলমানগণ কি পৃথিবীতে সর্বপ্রথম চিনি তৈরি করেন নি? এবং 'শাকার' নাম তো তাঁদেরই দেওয়া, তার থেকেই ইংরেজির 'সুগার' শব্দ উদ্ভূত।

পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মুদ্রার পরিবর্তে নোটের প্রচলন কি মুসলমানদের অবদান নয়? 'চেক' শব্দটি কি ফারসী 'চক' এবং আরবী 'সক্' হতে নেওয়া নয়? গ্রীক পণ্ডিত টলেমির ভৌগলিক বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পুস্তকটি ৮৩০ সালে জনাব আল খারেজিমী কি অনুবাদ করেন নি? উনসত্তর জন মুসলমান ভূগোলবিদ্ নিয়ে পৃথিবীর প্রথম মানচিত্র কি আঁকা হয়নি? যেটার নাম দেওয়া হয়েছিল 'সুরাতুল আরদ', যার বঙ্গার্থ হোল, পৃথিবীর আকার।

জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফরগানী, বাত্তানি, ইবনে ইউনুস প্রভৃতি মুসলমান পণ্ডিতদের অক্ষরেখা, দ্রাঘিমা ও মণ্ডল [zone] বিষয়ে গবেষণা কি ইউরোপ মাথা পেতে স্বীকার করেনি ?

ন'শতকের পর হতেই মুসলমান পণ্ডিতগণ ভূতত্ত্বের উপর অনেক গবেষণাপূর্ণ পুস্তক প্রণয়ন শুরু করেন। পরের যুগে ইসতেখারী, ইবনে হাওকল এবং আল মুকাদ্দাসির নাম কি স্বর্ণাক্ষরে লেখার মত নয়? 'মাসালিক ওয়াল মামালিক' গ্রন্থে রঙিন মানচিত্র অঙ্কনের গোড়াপত্তন কি মুসলমানদের অবদান নয়? ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে বিখ্যাত বৃহৎ আরবী গ্রন্থ 'মুজাম-আল-উবাদা' কি ইয়াকুত ইবনে আব্দুল্লার উল্লেখযোগ্য অবদান নয়?

১৪৯৮ সালে ভাস্কো-ডা-গামা আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে যাঁর কাছ হতে সমুদ্রপথের মানচিত্র, দিগনির্ণয় যন্ত্র এবং জলের গভীরতা ও স্রোত নির্ধারণের প্রাথমিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতি উপহার ও প্রয়োজনীয় উপদেশ পেয়েছিলেন তিনি কি ইবনে আব্দুল মজিদ নন?

পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কম্পাস যন্ত্রের আবিষ্কারক হচ্ছেন ইবনে আহমাদ—স্যার বারটনের বিবরণে স্পষ্টভাবে কি তা লেখা নেই? আজ দার্শনিকদের বাজারে যাঁদের নাম সহজলভ্য তাঁরা হলেন এরিস্টটল, সক্রেটিস, কাণ্ট, হেগ্ল, আলেবার্ড, আকুইনাস প্রভৃতি। কিন্তু তাঁদের পাশাপাশি যে সমস্ত মুসলিম দার্শনিকদের নাম আমরা ভুলতে চলেছি তাঁরা হচ্ছেন আলকিন্দি, আলফারাবি, রুশ্দ্, আবুসিনা, ইবনে মাসাররা, ইমাম গাজ্জালি প্রভৃতি মনীষীবৃন্দ।

বিজ্ঞান বিষয়ের উপর উল্লেখযোগ্য ২৭৫ খানি গবেষণামূলক গ্রন্থ যিনি লিখেছেন তিনিই হচ্ছেন জনাব আলকিন্দি। আর যে তিনজন মুসলমান বিজ্ঞানী ৮৬০ সালে সম্মিলিতভাবে একশো রকম যন্ত্রপাতি তৈরির শিক্ষা প্রণালীর উপর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তাঁরা হচ্ছেন হাসান, আহমাদ ও মুহাম্মাদ।

চার্লস্ ডারউইনকে বিবর্তনবাদের জন্মদাতা বলে আমরা মনে করি। কিন্তু ঘোড়া, উট, বন্য জন্তু, বৃক্ষ লতাপাতা প্রভৃতি নিয়ে যিনি অনেকগুলো বই লিখে গেছেন তিনিই জনাব আল আসমাই। ৭৪০ খৃষ্টাব্দে জন্মে ৮২৮এ মারা যান তিনি।

৭০২ খৃষ্টাব্দে ইউসুফ ইবনে উমার তুলোট কাগজ বা ব্লটিং পেপার সৃষ্টি করেন এবং ৭০৪ খৃষ্টাব্দে বাগদাদে মুসলিমদের দ্বারা কাগজের কারখানা নির্মিত হয়।

রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাসে জাবীরের নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তাঁর পূর্ণ নাম আবু মুসা জাবীর ইবনে হাইয়ান। ইংরেজি পুস্তকে তাঁর নাম শুধু Geber লেখা আছে; তাই পাত্তা পাওয়া মুশকিল। তিনি ইস্পাত তৈরি, ধাতুর শোধন, তরল বাষ্পীয়করণ, কাপড় ও চামড়ার রং, ওয়াটার প্রুফ তৈরি, লোহায় মরিচা প্রতিরোধক বার্নিশ, চুলের কলপ ও লেখার পাকা কালি তৈরির জন্য অমর হওয়ার দাবি রাখেন। তাছাড়া ম্যাঙ্গানীজ-ডাই-অক্সাইড হতে কাঁচ তৈরিও তাঁর অবদান।

এমনি বিখ্যাত বিজ্ঞানী আররাজীর নামও ঢাকা পড়ে গেছে; যাঁকে ইংরেজি ইতিহাসে Razes বলা হয়েছে। তিনি ধর্ম বিশারদ, দার্শনিক, গণিতজ্ঞ এবং চিকিৎসা বিশারদ ছিলেন। সোহাগা, লবণ, পারদ, গন্ধক, আর্সেনিক ও সালমিয়াক নিয়ে তাঁর লেখা ও গবেষণা উল্লেখযোগ্য। তিনিই পৃথিবীতে প্রথম বরফ তৈরি করেন। প ..। ইউরোপ তাঁর পদ্ধতিতেই বরফ তৈরি করতে শেখে।

আবু রাইহান মুহাম্মাদ আল বিরুনী, যাঁকে 'উস্তাদ' বলা হোত, ইতিহাস, গণিত এবং বিজ্ঞানে তাঁর মৌলিক অবদানও চাপা পড়ে যাওয়ার মতই হয়েছে।

মুসলমান বিজ্ঞানীরা একটি সংঘ তৈরি করেছিলেন যার নাম 'ইখওয়ানুস্সাফা'। বিজ্ঞানের উপর পর পর বাহান্নটি বই তাঁরা বের করেছিলেন। তাঁদের সময়েই খলিফা হারুনুর রশিদের যুগে সর্বপ্রথম জলঘড়ি তৈরি হয়।

এ্যালজেবরা বা বীজগণিতের জন্মদাতা ইবনে মুসা খেরজমীর নাম আজ বেশির ভাগ লোক জানতে পারছো না। ইংরেজি ইতিহাসে ঐ সুন্দর নামকে বিকৃত করে কোন স্থানে Algorism আবার কোন কোন বইয়ে Algorithm লেখা হয়েছে; যাতে পাত্তাই পাওয়া যাবেনা নামটি আসলে কী এবং কার? এমনি ওমর খইয়ামের গণিতজ্ঞান আরও উন্নত ধরণের ছিল। ঠিক এমনিভাবে নাসিরুদ্দিন তুসী জ্যামিতির উপর অক্ষয় অবদান রেখে ১২৭৪ খৃষ্টাব্দে মারা যান।

কিতাবুল ইকতেসার, আল আশকালুল কুররিয়া, আল হিয়ালুল আমালিয়া প্রভৃতি আরবী বইগুলোর লেখক যথাক্রমে ইবনে সালাত ও বনি-শাকের প্রমুখ।

আজ আকাশ অভিযানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে তাই বৃটেন, আমেরিকা এবং অনেক দেশেই তার জন্য মানমন্দির বা মহাকাশ গবেষণাগার তৈরি হয়েছে। কিন্তু পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মানমন্দির তৈরি করেন হাজ্জাজ ইবনে মাসর এবং হুনাইন ইবনে ইসহাক। সেটা ছিল ৭২৭ খৃষ্টাব্দ। তারপর জন্দেশপুরে তৈরি হয় দ্বিতীয় মানমন্দির ৮৩০ সালে। বাগদাদে তৈরি হয় তৃতীয় মানমন্দির। দামেস্ক শহরে আলমামুন কর্তৃক তৈরি হয় চতুর্থ মানমন্দির। বিজ্ঞানে মুসলমানদের এইসব অবদান আজকের ছেলেরা যাতে জানতে পারে তার ব্যবস্থা আদৌ করা হয় নি। তারা আইনষ্টাইন, নিউটন, ফ্যারাডে, মার্কনী, কাণ্ট, হেগল, ইউক্লিড প্রভৃতি মনীষীদের নাম জানে কিন্তু মুসলমান মনীষী যাঁরা আরব বিখ্যাত ও দেশ বিখ্যাত শুধু নন বরং বিশ্ববিখ্যাত, তাঁদের নাম জানে কি? তাঁরা কারা? কোন্ কোন্ বিষয়ে তাঁদের অবদান আছে? এবং তাঁরা কি কি বই লিখে গেছেন? আর সেই বইগুলো কেমন করে অনূদিত হয়ে পৃথিবীর সমাদৃত সম্পদ বলে স্বীকৃত তা আজ লিখতে গেলে বিরাট গ্রন্থ হয়ে যাবে। যদিও তা খুব মূল্যবান হবে তথাপি অনেকের কাছে তা সরস না হয়ে হয়ত নীরস পাঠ্যই হবে।

যাঁরা বিজ্ঞান, দর্শন, ভূগোল ও চিকিৎসায় বিরাট প্রভাবশালী, যাঁরা বিখ্যাত হয়েও অখ্যাত, তাঁরা হচ্ছেন আস্‌ফাজারী, খাজিনি, হাকিম লুকবী, ইবনে কুশাক, আব্দুল বাকী বাগদাদী, বদি উল আসতারলাবি, খারাকী, আব্দুল মালিক আস্ সিরাজি, ইবনুদ দাহ্‌হান, আদনান-আল-আইনজাররী, আবুস্‌সালাত, ইবনে বাজ্জা, ইবনে রুশদ, ইবনে তোফায়েল, রাজী, কামালুদ্দিন ইবনে ইউনুস, শরফুদ্দিন তুসী, ফারিসি, নাসিরুদ্দিন, মহীয়ুদ্দিন, শামসুদ্দিন শমরকন্দী, আবহারি, কাতিবি, কাজবিনি, সাইমুনুর রশিদ, ইবনোল ইয়াসিমিনি, কাইসার ইবনে আবুল কাসেম, হাসান আলমারাবুশী, হাস্‌সার, বিতুরুজী, ইবনোল কাতিব, ইবনোল বান্না, উলুগবেগ, আলকারখি, আলকাশী, ইবনুল হাউম, কুশজী, ইবনোল মাজিদি, কালাসাদি, মোহাম্মদ ইবনে মা'রুফ, আল্লাহদাদ, আতাউল্লাহ, লুতফুল্লাহ, খাইরুল্লাহ, মুহাম্মদ কাজীন নাজিব ওক্তি, মামুরী, বাইহাকী, ওমর খৈয়াম, উরদী ও জাবির প্রমুখ।

একটি একটি করে যদি এক এক জনের আবিষ্কারের অবদান আর বৈশিষ্ট্য লেখা যায় তাহলে বই বেড়েই যাবে। মোট ৫০ জনের মধ্যে শুধু দু-তিন জনের নামে একটু আলোকপাত করলে বুদ্ধিমান পাঠক আঁচ করতে পারবেন আহত নিহত ইতিহাসের খতিয়ান। দু-তিন জন বলতে ওমর খৈয়াম, উরদী ও জাবিরের কথাই ধরা যাক।

ওমর খৈয়ামকে আমরা জানি তিনি শুধু কবি ছিলেন কিন্তু তিনি যে মস্ত বড় বিজ্ঞানী ছিলেন সেদিকটা আজ অজ্ঞাতপ্রায়। ১০১৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম এবং ১১২৪ খৃষ্টাব্দে হয় তাঁর মৃত্যু। তিনি যৌবনকালে উপাধি পেয়েছিলেন হুজ্জাতুল হক্ অর্থাৎ সত্য প্রমাণকারী। বিখ্যাত গ্রন্থ 'আলজাবর' বীজগণিতের বই লিখে তিনি রাজদরবারে স্বীকৃতি লাভ করেন। তারপর হান্দাসা বা জ্যামিতি, পরিমিতি, বর্গমূল, ঘনমূল প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণামূলক সূত্র আবিষ্কার করেন। অথচ মনে রাখার কথা হোল ওমরের

বিখ্যাত বই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল আবার সেই বইই পুনরায় লেখককে বিশ্ববিখ্যাত করেছে। ভগ্নাংশীয় সমীকরণের [fractional equation] সর্বপ্রথম উল্লেখ, আলোচনা ও সমাধান ওমরেরই সূত্রপাত। ওমর মোট বাইশখানা গ্রন্থ লিখে গেছেন তার মধ্যে রুবাইয়াত বইটিতে তাঁর কবিতা ও সাহিত্য প্রতিভা প্রমাণ হয়। বাকী গ্রন্থগুলো বেশির ভাগই বিজ্ঞান বিশ্বের মূল্যবান সম্পদ। A Hand Book on Natural Science গ্রন্থটি ওমর খৈয়ামেরই আরবী গ্রন্থের অনুবাদ। কিছুদিন পূর্বে কলম্বিয়া ইউনিভারসিটির প্রফেসর D. L. Smith লাহোরে পুরাতন পুস্তক বিক্রেতার কাছ হতে ওমর খৈয়ামের লেখা পাণ্ডুলিপি কিনেছেন। বইটির নাম 'আল জাবর ওয়াল মুকাবিলা'।

উরদী জন্মেছিলেন সিরিয়ায়, তাঁর ভাষা ছিল আরবী। দামাস্কাসে তাঁর ইঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞানের সাক্ষী হচ্ছে তাঁর Hydraulic প্রস্তুত করা। মারাঘাতে যে মানমন্দির ছিল সেই মানমন্দির সংলগ্ন তিনি একটি কারখানা করেন। সেই কারখানায় শুধু আকাশ তথা সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ, শূন্য প্রভৃতি নিয়ে গবেষণা করতে যে সব যন্ত্রপাতি প্রয়োজন তা তৈরি করেন এবং অনেক যন্ত্র আবিষ্কারও করেন। ভবিষ্যতে যাতে যন্ত্রপাতি তৈরি করা সহজ হয় তার জন্য তিনি আরবীতে একখানি বিরাট গ্রন্থও লেখেন। বইটির নামও বেশ বড়—'রিসালা ফি কাইফিয়াতিস সাদ ওয়ামা ইউহতাজু ইলা ইলমিহি ওয়া আমালিহি মিন তুরুকিল মুয়াদ্দিয়াহ ইলা মারিফাতি আওদাতিল কাওয়াকিব।' তারই ইংরেজি নাম হচ্ছে—The art of Astronomical Observations and the Theoretical Method Leading to the Understanding of Regularities of Stars.

যে বিখ্যাত গ্রন্থগুলো তিনি প্রণয়ন করে গেছেন সেগুলোরই ইংরেজি নাম হচ্ছে [১] Mural Quadrant, [২] Armillary Sphere, [৩] Solistitial Armil, [৪] Equinoctial Armil, [৫] Hipparalis Dipoter (alidade), [৬] Instrument With Two Quadrants, [৭] Instrument With Two Limbs, [৮] Instrument to Determine Sine and Azimuth, [৯] Instrument to Determine Sine and Versed Sine, [১০] The Perfect Instrument প্রভৃতি। এছাড়া আরও দু'খানি বই তিনি লিখেছেন—'রিসালা ফি আমালিল কুবা-আলকামি।' ইংরাজীতে যেটাকে Construction of the perplet sphere বলা হয়। তাঁর ছেলেও একজন বিজ্ঞানী ছিলেন; পিতার সহকর্মী হিসাবে পিতাকে সাহায্য করতেন। এই পুত্রের উন্নত ধরণের গ্লোব তৈরি প্রশংসার দাবী রাখে। গ্লোবটা তৈরি হয় ১২৭৯ খৃষ্টাব্দে। তাঁর নাম ছিল মুহাম্মাদ।

এবার বিজ্ঞানী জাবিরের উপর সামান্য আলোকপাত করা যাক। তাঁর জন্মের সঠিক তারিখ পাওয়া যায়নি। তবে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১১৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই। এটা প্রমাণিত। 'বিজ্ঞানে মুসলমানের দান' গ্রন্থে লেখক জনাব এম. আকবর আলী

বলেছেন, মিঃ ক্যাজোবীর মতানুযায়ী একাদশ শতাব্দীর শেষে সেভিলে তাঁর জন্ম হয়। মিঃ টলেমীর বিজ্ঞান জগতে উচ্চ প্রশংসনীয় যে সূত্র বিশ্বব্যাপী হয়েছিল সেটা হচ্ছে 'Rule of Six Quantities'। কিন্তু বিশ্বব্যাপী সিদ্ধান্তকে ভুল প্রমাণ করে তাঁর আসন কেড়ে জাবির নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করলেন, প্রকাশ করলেন 'Rule of Four Quantities'। পৃথিবী সেদিন আলোড়িত হতে বাধ্য হয়েছিল। তাঁর জ্ঞান ও সৃজনী শক্তি আজ লুপ্ত হলেও ইতিহাসে তার উল্লেখ আছে। তিনিও বহু বই লিখেছেন যেমন —'কিতাবুল হায়া' এবং আলমাজেস্ট-এর সংশোধন করে একটি বিখ্যাত বই লেখেন 'ইসলাহুল মাজিস্তি'। জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে জাবিরের বিখ্যাত গ্রন্থটি অনুবাদ করেন মিঃ জিরার্ড। অবশ্য প্রথমে ল্যাটিন ভাষায় এবং পরে তা অনেক ভাষায় প্রকাশ করা হয়।

এই মনীষী 'জাবির' নামটিকে ইংরেজরা 'জিবার' লিখেছে। ফলে জাবির ইবনে হাইয়ান এবং জাবির নাম দুটি তালগোল পেকে গেছে। আসলে তাঁরা পৃথক পৃথক মানুষ।

এই সব দুর্লভ তথ্য ছাপলেই বলে ও কলে-কৌশলে সেই বই বাজেয়াপ্ত করা হলে ইতিহাস তাদের ধিক্কার দেবে যুগ যুগ ধরে। 'ইতিহাসের ইতিহাস' পড়ার সুযোগ যাঁদের ঘটেনি তাঁরা এবার অনুভব করতে পারছেন তাতে কী ছিল।

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারের ফল দেখবার জন্য চাতকের মত চেয়েছিলেন দেশের জনসাধারণ। নির্দিষ্ট সময়ে রায় বের হোল — যার মর্মকথা হোল : 'ইতিহাসের ইতিহাস'এর লেখক তাঁর বই বাজেয়াপ্ত হওয়ার পর যত দিনের মধ্যে মোকদ্দমা করা উচিত ছিল তিনি তা না করে ১৮দিন বিলম্ব করেছেন—এক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিচার করতেও পারে, নাও করতে পারে; সুতরাং বিচার না করারই সিদ্ধান্ত নেওয়া হোল। আমি আইনের বিষয়ে উকিলের উপর নির্ভরশীল ছিলাম কিন্তু প্রথম উকিল বিলম্ব ঘটিয়ে যে ক্ষতি করলেন তা মনে হয়েছিল পূরণ হওয়ার নয়। অবশ্য সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার রাস্তা খোলা থাকলেও নানা কারণে ওদিকে না গিয়ে নতুন চিন্তাধারায় 'চেপে রাখা ইতিহাস' নামে একখানি বই জনগণের হাতে তুলে দিই। দেশের বুদ্ধিজীবী মহল সেই বই পড়ে যা মন্তব্য করেছেন তার সার আমি এই বুঝেছি যে, যাঁরা 'ইতিহাসের ইতিহাস' ও 'চেপে রাখা ইতিহাস' দুটো বইই পড়েছেন তাঁরা 'চেপে রাখা ইতিহাস'কেই দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনায় অধিকতর চিত্তাকর্ষক বলে মনে করেছেন।

'চেপে রাখা ইতিহাস' পড়ে স্বীকৃত পণ্ডিতগণ যে সব মন্তব্য দিয়েছেন এখানে তার সবগুলো উল্লেখ করা সম্ভব নয়। কয়েকটি মন্তব্যের অংশবিশেষ উল্লেখ করেই পরিসমাপ্তি টানছি—

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভাগীয় প্রধান, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সদস্য এবং অতিথি অধ্যাপক ডক্টর শোভনলাল মুখোপাধ্যায়

বলেন : "আলোচ্য বইখানি বাংলার, তথা ভারতের হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি বৃদ্ধি করতে খুবই সহায়ক হবে।... লেখক জনাব মোর্তজা সাহেবকে ধন্যবাদ যে, তিনি ভারতের ও বাংলার ইতিহাসের অনেক ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন ও নির্ভীকভাবে উপযুক্ত তথ্যাদির সাহায্যে সেই ঘটনাগুলোর অনেকগুলোকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করেছেন। তাঁর প্রদত্ত তথ্য প্রমাণগুলি ভবিষ্যতেও অন্যান্য গবেষকদের কাছে মৌলিক উপাদানরূপে খুব কাজে লাগবে।... বইটি পড়ে জানবার মত অনেক কিছু পাঠক খুঁজে পাবেন নিঃসন্দেহে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অমলেন্দু দে দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় [২৩.১.৮৮] সমালোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন,"... লেখক যে সব গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা সবই প্রকাশিত গ্রন্থ; কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এইসব গ্রন্থের সঙ্গে সুপরিচিত।"

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অমিত মল্লিক বলেন,"গোলাম আহমেদ মোর্তজা প্রণীত 'চেপে রাখা ইতিহাস' বইটি তাঁর দীর্ঘ এবং শ্রমসাপেক্ষ গবেষণার ফল।"

অধ্যাপক সত্যনারায়ণ ব্যানার্জী বলেন, " 'চেপে রাখা ইতিহাস' পুস্তকটি প্রতিটি শিক্ষিত, বিশেষ করে ইতিহাসের ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকের পড়া উচিত।... বইটি পড়ে অনেক নতুন তথ্য জানলাম, যা আগে জানা ছিল না। বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

অধ্যাপক শশাঙ্ক শেখর বসু বলেন,"...Golam Ahmed Mortaza known to us as a man well-versed in the history of Islam and respected for his erudition and art of eloquency..."

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রমাকান্ত চক্রবর্তী বলেন,"ভারতের মধ্যকালীন এবং আধুনিক ইতিহাসে ইসলাম-এর এবং মুসলমানদের ভূমিকা এবং স্থান অতি বিশিষ্ট। এই তথ্যকে যাঁরা অবহেলা করেন, তাঁরা ইতিহাসকে চেপে রাখেন। এ গ্রন্থে এটি লেখকের প্রধান যুক্তি। এই যুক্তিটিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম করেছেন। বিভিন্ন উৎস থেকে তিনি তথ্য আহরণ করেছেন। বস্তুতঃ ভারতের মধ্যকালীন এবং আধুনিক ইতিহাসের হিন্দু-সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা এবং সে ব্যাখ্যাতে ইসলাম-এর এবং মুসলমানদের বিদূষণ বিকৃত রুচির পরিচয় বহন করে। তা গ্রাহ্য হতে পারে না। এটি লেখকের [এবং আমাদেরও] যুক্তি। এখন একতার উপরেই জোর পড়ুক; বিভিন্নতা বিচ্ছিন্নতা মিলিয়ে যাক্।"

কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন, 'চেপে রাখা ইতিহাসে'র লেখক প্রচুর পরিশ্রম করিয়া এই পুস্তক লিখিয়াছেন। এই পুস্তকে বহু বিতর্কিত বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে।...পুস্তকটি প্রশংসার দাবী রাখে।"

কলকাতার মৌলানা আজাদ [গভঃ] কলেজের অধ্যাপিকা উত্তরা চক্রবর্তী বলেন, "জ্ঞানচর্চা এবং বৈষয়িক বিদ্যালোচনায় আরব পণ্ডিতদের অবদান সর্বজন স্বীকৃত। ধর্মবিভক্ত ভারতীয় সমাজের নিম্নবর্ণের অত্যাচারিত জনসমষ্টি ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের তাড়নায় যে অনেক বৌদ্ধ ইসলামের আশ্রয় নিয়েছিল, ইতিহাস এ তথ্য অস্বীকার করে নি।...চিত্রকূটের কাছে রামঘাটের বালাজী মন্দির বা বিষ্ণুমন্দির যে ঔরঙ্গজেবের তৈরী এটি নতুন তথ্য। ঔরঙ্গজেব যে হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন না এ কথাও ঐতিহাসিক সত্য।"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের বিশিষ্ট অধ্যাপক মোঃ আনোয়ার জাহিদ লেখেন, 'ইতিহাস গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে সত্য আবিষ্কার ও জাতির ভবিষ্যত পথনির্দেশ।....তাঁর লেখনী বিকৃত ইতিহাসের স্থলে প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরে ইতিহাসের প্রতি ন্যায় বিচার করেছে।"

ময়মনসিংহ এগ্রিঃ ইউনিভার্সিটির আব্দুল মালেক আকন্দ বলেন, ".....অনুসন্ধিৎসু মন নিয়াই আমি বইখানা পড়িলাম। আমি ধন্য। মনে হইল বইখানা মোর্তজা সাহেবের শুধু ইতিহাস লেখাই নয়, এ যেন ইতিহাস জগতে নিগূঢ় সত্য উদ্ধারের এক নিরলস সাধনা।"

১.৬.'৯৭ তারিখে দৈনিক পত্রিকা 'আজকাল' লেখেন ঃ "প্রচলিত ইতিহাসের বাইরে আলোচ্য বইটিতে অন্যরকম কাহিনী বলতে চেয়েছেন ইতিহাস গবেষক গোলাম আহমাদ মোর্তজা।.....গবেষণাধর্মী বা বিভিন্ন বই থেকে উদ্ধৃতির প্রাচুর্য থাকলেও তাঁর পরিবেশনের স্টাইলটা বেশ সহজ সরল, ভাষাও টানটান, ফলে বৃহৎ বইটি অনায়াসে শেষ করে ফেলা যায়। .... মোর্তজা সাহেবের এই বইটিও একইসঙ্গে তেমন পরিচিত ও বহুল পঠিত হলে আখেরে শিক্ষক, গবেষক ও ছাত্রছাত্রীরা উপকৃতই হবেন, বিশেষকরে ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান যাঁদের অন্যতম বিষয়। .... আর এজন্য লেখক প্রচলিত ইতিহাসের পথে হাঁটেন নি। বরং সেই ইতিহাসের যাবতীয় বিকৃতি ও ভুলকে চিনিয়ে দেওয়ার জন্যই তাঁর এই 'বজ্রকলম'।"
[সমালোচনা ঃ অধ্যাপক অনীশ ঘোষ]

বিবেকানন্দ কলেজের অধ্যক্ষ এ. রায় বলেন, "Undoubtedly he is a well-read scholar specialising in the history of Muslim religion. The approach of the author is non-communal and his efforts for preserving amity among people of different religions are praiseworthy. In a problem-ridden country like ours, men like Golam Ahmed Mortaza should be encouraged by all for his well thought out ideas about secularity showing respect to various religions including Islam."

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীগোলকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, " 'চেপে রাখা ইতিহাস' গ্রন্থটি রাজনীতি ও ইতিহাসের ছাত্রদের খুব উপযোগী।....গ্রন্থটি এমনভাবে রচিত হোয়েছে যে আমাদের দেশের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনটিকে পরিশুদ্ধ করার একটা প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় থাকলে দেশের সামগ্রিক উন্নতি আশা করা যায়। সেদিক থেকে বইটি সর্বজন পঠিত হোলে সমাজজীবন আরও উন্নততর হবে নিশ্চিত আশা করা যায়। বইটি বহুল প্রচারিত হোক এই কামনা করি।"